বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৩ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

তাসনিনা ফেরদৌস তুসি, দশম শ্রেণি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

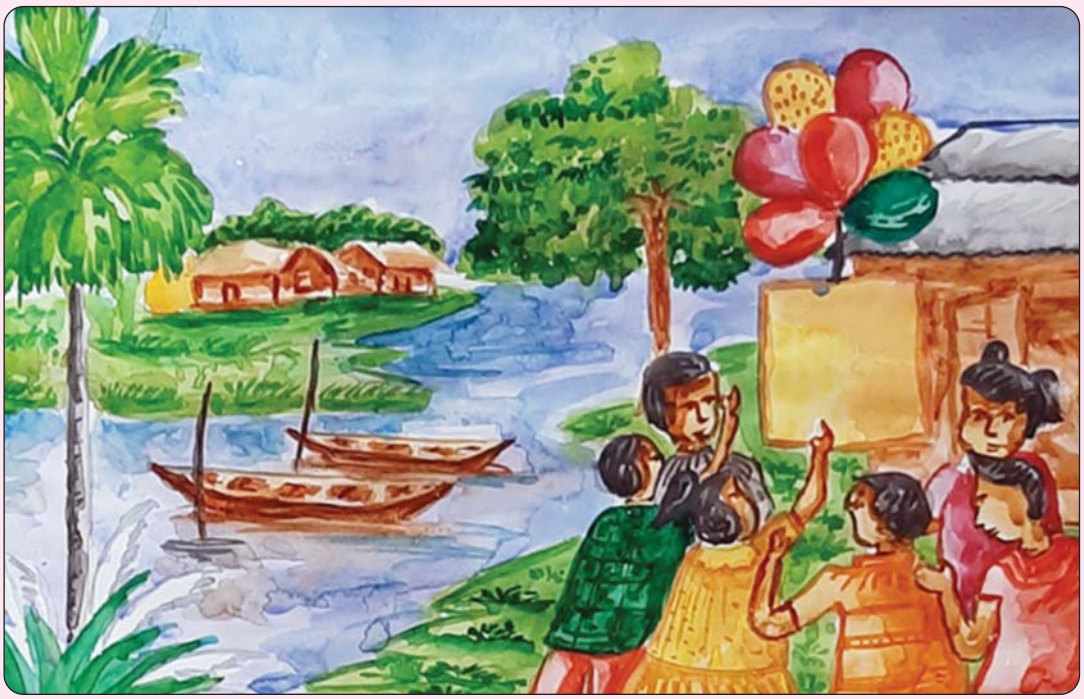

লাবিবা জামান লিবা, চতুর্থ শ্রেণি, যশোর ইনস্টিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

ষোলোই ডিসেম্বর। আমাদের মহান বিজয় দিবস। নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে এই দিনে আমরা পরাধীনতার শিকল ভেঙে বিজয় অর্জন করেছি। পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশ নামের একটি নতুন দেশ। তাই এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ অর্জন।

যাঁর নেতৃত্বে আমরা এই মহান বিজয় পেয়েছি তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানেই এই দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ নয় মাস মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মাসেই আমরা হারিয়েছি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের।

আমরা ১৬ই ডিসেম্বর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জানা-অজানা লাখো শহিদদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। দিনটিতে আমরা আনন্দ ও উৎসব করি, বিজয়ের উল্লাস করি।

নবারুণের বন্ধুরা, লাল-সবুজ এই বিজয়ের মাসে নবারুণ তোমাদের জন্য নিয়ে এল বিশেষ এই সংখ্যাটি। এ সংখ্যায় তোমরা পড়বে মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বিভিন্ন মজার ও শিক্ষণীয় গল্প/নিবন্ধ/ছড়া/কবিতা/অনুবাদ গল্প। আরো থাকবে ছোটোদের আঁকা ছবি। আশা করি সংখ্যাটি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে। তোমাদের সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

১২ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার/ দেলওয়ার বিন রশিদ
২৪ বীরশ্রেষ্ঠদের সাতকাহন/মাহমুদুল হাসান খোকন
৪৫ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস/নুসরাত জাহান
৬৪ রাতারগুলে একদিন/মোহাম্মদ মামুন হোসেন
৬৬ বিজয়ের মাসে বিরল সম্মান/সাব্বির আহমেদ
৬৮ অতিথি পাখির আসা-যাওয়া/মো. ইকবাল হোসেন
৭০ শীতে শিশুর যত্ন/মো. জামাল উদ্দিন

রূপকথার গল্প

৫৬ মায়াপঙ্খি ও বৃক্ষকুমার/ইউনুস আহমেদ

সাফল্য প্রতিবেদন

৭১ দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে হারালো বাংলাদেশ/ মেজবাউল হক
৭২ হাওর পাড়ের শিশু পেল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার/ জান্নাতে রোজী
৭৩ অন্যের কণ্ঠ নকল/ শাহানা আফরোজ
৭৪ ছয় সাঁতারুর সাফল্য/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭৫ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ মো. সারোয়ার হোসেন
৭৭ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৭৯ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

ছোটোদের ছড়া

৪৪ সানোয়ার কবীর/নাহিদা সুলতানা
৭৬ মো. সাকিবুল ইসলাম/রুপা আক্তার

গল্প

০৩ মুক্তিযুদ্ধের গল্প/আহসান হাবীব
০৭ ত্রিপুরায় ছয় বন্ধু/মনি হায়দার
১৭ বুড়ো আঙুল/ধ্রুব নীল
২১ বাবার রেডিও/ মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী
২৭ বীরদের ফিরে আসা/ রহিমা আক্তার মৌ
৩২ ফায়ান ও ময়না পাখি/ মুহিবুল্লাহ কাফি
৩৮ শালবনের সূর্যশিখা/ মোস্তাফিজুল হক
৪২ শিমুলের বিজয় দিবস/মমতাজ আহাম্মদ
৪৭ স্বাধীনতার সুখ/ মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন
৫১ বোবা রোবট/ নাজমুল হুদা
৫৯ মন্টু মামার বাঘ শিকার/জাফর তালুকদার

কবিতাগুচ্ছ

১৫ শাফিকুর রাহী/স. ম. শামসুল আলম
১৬ চন্দনকৃষ্ণ পাল/সাদ্দাম হোসেন
৩৬ শ. ম শহীদ/আনোয়ারুল হক নূরী
৩৭ খোরশেদ আলম নয়ন/মিয়াজান কবীর/ গোলাম নবী পান্না
৫৫ শহীদুল্লাহ শোভন
৫৮ রকিবুল ইসলাম/আতিক রহমান

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : তাসনিনা ফেরদৌস তুসি, লাবিবা জামান লিবা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সুমিত/আয়ান হক ভুঁইয়া
শেষ প্রচ্ছদ : আফিফা মাইমুনা লাবিবা
১১ নাফিসা তাসনিম স্নেহা
৩১ আরিশা হাসান
৪১ মুজতানিবা মোজাহিদ
৪৬ রিয়ন দত্ত
৫০ আয়েশা উমামা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*- এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

গল্প

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

আহসান হাবীব

সঞ্জুরা গ্রামে ওদের দাদা বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। গ্রামে বন্ধুদের সাথে বনেবাদাড়ে ঘুরে ভালো সময় কাটছে। মাঝেমধ্যে বাড়ির পিছনের পুকুরে দাপাদাপিও বেশ হচ্ছে। সবশেষে সন্ধ্যার দিকে দাদার ঘরে যায়। দাদা শুয়ে শুয়ে বই পড়েন। সবাই জানে সঞ্জুর দাদা ছিলেন একজন নামকরা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, তার গল্পের ঝুলিতে নানান রকম গল্প। কাজেই সন্ধ্যা হলেই সঞ্জু গিয়ে দাদাকে ধরে গল্প বলার জন্য। দাদাও বই রেখে শহুরে নাতিকে টুকটাক গল্প শোনান। একদিন সঞ্জু গিয়ে বলল-

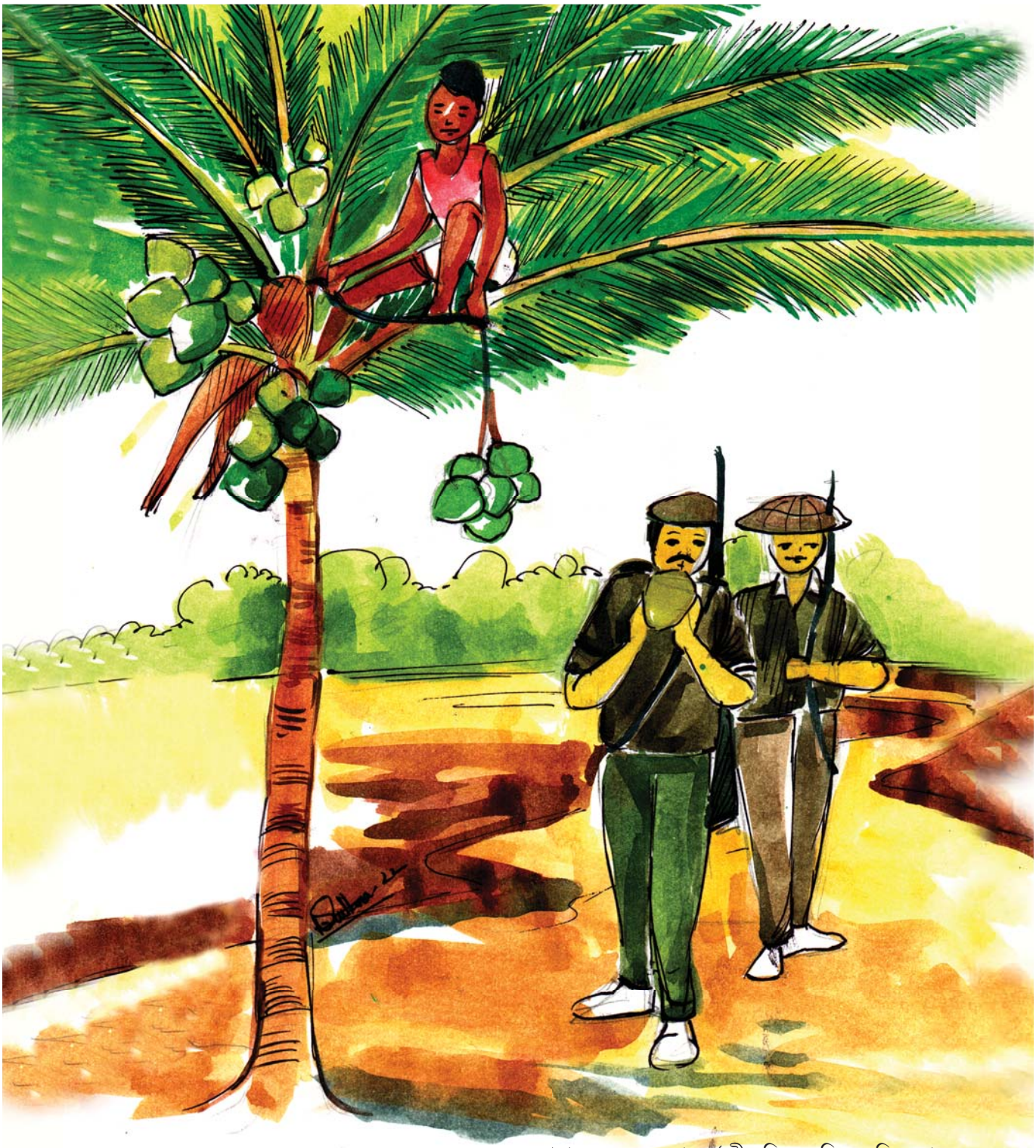

- দাদা তুমি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলে।
- হ্যাঁ ছিলাম তো।
- তাহলে মুক্তিযুদ্ধের একটা মজার গল্প বলো।

দাদার ভ্রু কুচকে যায়। 'কী বলিস, মুক্তিযুদ্ধ কি মজার কোনো ঘটনা? এত বড়ো যুদ্ধে কত বন্ধুকে হারালাম। কত আত্মীয়স্বজন হারালাম, কত সহযোদ্ধাকে হারালাম... আহা। দাদা গামছা দিয়ে চোখ মুছেন। সঞ্জুর দিকে তাকান।

- বুঝলি, ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তে আমরা এ দেশ পেয়েছি। এখানে মজা কোথায় রে?

- সরি, দাদা।

- না ঠিক আছে। বুঝলি মুক্তিযুদ্ধ অনেক বড়ো ব্যাপার, বোঝার ব্যাপার কেন আমরা যুদ্ধ করেছি। দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর ফের শুরু করলেন, ...'তবে মজার ঘটনা একেবারেই যে ঘটেনি তাও বলা যাবে না।' বলে দাদা কুটকুট করে হাসতে লাগলেন।

- হাসছ কেন দাদা?

- একটা ঘটনা মনে পড়ল তাই হাসছি।

- কী ঘটনা?

- তোর কথা মনে করেই বোধহয় গল্পটা মনে পড়ল।
- বলো না দাদা।

- তাহলে শোন, তখন আমি মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার। আমার আন্ডারে ছিল প্রায় এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা।

- এক প্লাটুনে কত জন থাকে?

- তা প্রায় ২০ - ২২ জন। আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে যে বাচ্চা ছেলেটা, সে একদিন ছুটি চেয়ে বসল। আমি বললাম এখন ছুটি কেন?

- বাড়ির অনেক কাছে চলে এসেছি স্যার, তাই ভাবছিলাম দুটো দিন যদি ছুটি দেন তাহলে বাবা-মাকে একটু দেখে আসতে পারতাম। এটা ঠিক আমরা তখন ওর বাড়ির কাছাকাছি, জায়গাটার নাম সম্ভবত কমলাকান্দা। সেখানে একটা অপারেশন করতে এসেছিলাম আমরা। সাতদিন পরেই অপারেশন করব এরকম ভাবছিলাম। সেই ফাঁকে ও যদি দু'দিনের জন্য ঘুরে আসতে পারে বাড়ি থেকে। তা হলে যাক। শেষ পর্যন্ত ওকে ছুটি দেওয়া হলো। একটু রেকিও করে আসুক এলাকাটা।

- রেকি কী?

- রেকি হচ্ছে কোনো অপারেশনের আগেই জায়াগাটা সম্পর্কে একটু বুঝেসুঝে আসা আরকি, কী সুবিধা-অসুবিধা আছে এই সব। তো ছেলেটার নাম ছিল মালেক। সে তার এলাকায় গিয়ে দেখে তাদের এলাকার সরকারি প্রাইমারি স্কুলে মিলিটারিরা ক্যাম্প করেছে। আমরা শুনে ছিলাম হাই স্কুলে ক্যাম্প করেছে। কাজেই এই তথ্যটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তো মিলিটারিরা দুপুর হলেই দু-তিনজন করে ঘুরতে বের হয় গ্রামে। এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে ছাগল, মুরগি এসব নিয়ে যায়। কেউ কিছু বলতেও পারে না ভয়ে। তো একদিন মালেক ধরা খেয়ে গেল। তিনজন মিলিটারি ওকে ধরেছে গাছে উঠে ওদের ডাব পেরে দিতে হবে, ওরা ডাব খাবে। মালেক মহা বিপদে পড়ল, ও খুব ভালো গাছে উঠতে পারে না। সে গাছে উঠতে পারে না বলতেই ওকে রাইফেলের বাট দিয়ে দিল দুই-তিন ঘা। কী আর করা, সে বাধ্য হয়ে একটা দা নিয়ে বহু কষ্টে গাছ বেয়ে উঠতে লাগল। বেশ লম্বা নারকেল গাছ। একদম যখন গাছের মাথায় উঠে গেল তখন সে দেখতে পেল বিশাল একটা বল্লার চাক।

- বল্লা কী?

- আরে বল্লা চিনিস না? মৌমাছির মতোই এরা ঘর বানায়, তবে মাটির ঘর। দেখতে হলুদ রঙের, মারাত্মক হুল। একবার কামড় দিলে...

- ও হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি। আমাদের স্কুলের একটা ক্লাসে বল্লার চাক ছিল তবে ছোট্ট।

- না, মালেক যে বল্লার চাকটা দেখল সেটা বেশ বড়োসড়ো। তখনই তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে করল কী দায়ের এক কোপে বল্লার পুরো বাড়িটা ভেঙে নিচে ফেলে দিল একদম মিলিটারিরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে...ব্যাস।

- তারপর?

- তারপর বুঝলি না কী হলো? ঝাঁকে ঝাঁকে বল্লা ছুটে বেরুলো। সটান গিয়ে তিন মিলিটারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আশপাশে তো আর কেউ নেই। তারপর তো বুঝিস তিন মিলিটারি বল্লার কামড় খেয়ে ওদের অস্ত্র ফেলে হাউ মাউ খাউ চেঁচামেচি শুরু করে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। ওদিকে মালেক দ্রুত নেমে ওদের তিন অস্ত্র নিয়ে একদম চম্পট।

- ওহ দারুণ। কী অস্ত্র ছিল ওগুলো?

- একটা ছিল এসএলআর মানে লাইট মেশিন গান। আর দুটো ছিল চায়নিজ রাইফেল।

- ওগুলো কী করল?

ওগুলো নিয়ে সোজা আমাদের ক্যাম্পে-

- উনি বাবা-মার সঙ্গে দেখা করেননি?

- আগেই করেছিল শেষ দিন ঘটনাটা ঘটে।

- আর মিলিটারিগুলোর কী হলো?

- ওদের খবর কে রাখে। তার দু-দিন পর আমরা ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আক্রমণ করলাম। আমাদের তো অস্ত্র ছিলই । একটা তিন ইঞ্চি মর্টারও ছিল।

- যুদ্ধে তোমরা জিতেছিলে?

- অবশ্যই। কলমাকান্দার ওই যুদ্ধটা ছিল অনেক বড়ো একটা যুদ্ধ। মজার গল্প শোনা হলো তো, এবার যা ঘুমাতে যা।

রোমাঞ্চকর গল্পটা শুনে ঠিক উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আরো এরকম গল্প শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু দাদা তখন চোখে চশমা এঁটে বই খুলে বসেছেন। তাকে আর বিরক্ত না করে ভিতরে বাড়ির দিকে ছুটল। এই মজার কিন্তু ভয়ংকর গল্পটা সে এখন তার চাচাতো ফুফাতো ভাইদের শুনাবে। অবশ্য তারা যদি না দাদার কাছে এই গল্প আগেই শুনে থাকে। শুনলেই বা কি, মুক্তিযুদ্ধের গল্প বার বার শোনা যায়। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও কার্টুনিস্ট

গল্প

ত্রিপুরায় ছয় বন্ধু

মনি হায়দার

তুই যাবি?

মিথুনের প্রশ্নে মাথা নাড়ায় শিবু এবং ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠে বলে, যাবো।

ডানের দিকে মাটিতে বসা হিমুর দিকে তাকানোর সঙ্গে বলে, মুইতো যামুই। তয় লগে মোর ছোটো বুইনেও যাইবে। না লইয়া গেলে মুই যাইতে পারুম না।

হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মিথুন। কিংশুক মিথুনের সঙ্গে শিবু কুমার হালদার, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আলীয়া ফেরদৌসী, দীপক খানও তাকিয়ে থাকে। কিন্তু এতগুলো চোখের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় হিমু, মানে হেমায়েত আলী হিমু।

তোর ছোটো বোন যাবে কেন? ওর বয়স কত?

ওর বয়স...

তোমার সঙ্গে কে কে ত্রিপুরার শরণার্থী ক্যাম্পে এসেছে? কিংশুক মিথুন দাঁড়িয়ে জামগাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে। গত কয়েক দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিতে ত্রিপুরার এই এলাকাটা ভিজে একাকার। আজ সারাদিনে বৃষ্টি হয়নি। ফলে পথঘাট একটু ভেজা একটু শুকনো। চারপাশে গাছপালা। গাছপালার পাতা ভেদ করে মাটিতে সূর্যের আলো আসতে পারে না। চারদিকে স্যাঁতস্যাঁতে একটা ভাব। সেই স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটাকে আরো প্রকট করে তুলেছে রাজ্যির মানুষ।

মানুষ যে কত রকমের হয় কিংশুক ত্রিপুরায় এসে দেখে তা জানল। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার কমলাসাগর গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে কিংশুকরা। ওর বাড়ি কুমিল্লা শহরে। বাবা রেহানউদ্দিন স্কুলের শিক্ষক। কিংশুক পড়ে ক্লাস এইটে। সেই প্রথম শ্রেণি থেকে ক্লাসে প্রথম হয় সে। গায়েগতরে বাড়ন্ত। গোলগাল মুখের উপর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বাবা রেহানউদ্দিনকে দেখেছে মিছিল-মিটিং করতে। বাসায় বাবার বন্ধুরা আসলে আলোচনা চলত মুজিবুর, পাকিস্তান, ইয়াহিয়া খান, সাতই মার্চ, এবারের সংগ্রাম... ইত্যাদি নিয়ে। মাঝেমধ্যে পাড়ার ছেলে মেয়েদের নিয়ে মিছিল করেছে কিংশুক। ওদের শ্লোগান- তোমার আমার ঠিকানা... পদ্মা মেঘনা যমুনা। তোমার নেতা আমার নেতা... শেখ মুজিব শেখ মুজিব। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো... বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

কিন্তু সবকিছু তছনছ হয়ে গেল পঁচিশে মার্চ রাতে। কী হচ্ছিল বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু পরের দিন সকালে কুমিল্লা শহরের মধ্যে পাকিস্তানি আর্মি ঢুকল আর ট্রাকের উপর থেকে গুলির পর গুলি ছুড়তে থাকে। মানুষ পাখির মতো ছটফট করে বুকে গুলি নিয়ে মারা যেতে লাগল। রাস্তায় লাশ আর লাশ। সন্ধ্যার একটু আগে বাবা এসে ঘরের খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা বন্দুকটা নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে কিংশুককে জড়িয়ে ধরে বলে, বাজান যুদ্ধে যাইতেছি। দেশটা তো স্বাধীন করতে হবে। তুমি তোমার মা আর ছোটো বোনটাকে দেইখা রাইখো।

কিংশুক কিছুই বুঝতে পারছে না। ছোটো বোন নদী দু'হাত বাড়িয়ে বাবার দিকে ছুটে যায়, বাবা... বাবা...। দরজা থেকে

ফিরে এসে আবার নদীকে কোলে নিয়ে পাগলের মতো আদর করতে করতে মায়ের কোলে দিয়ে বলে, শোনো পারুল, ভয় পেয়ো না। ওরা আক্রমণ করছে নিরীহ নিরপরাধ জনগণের উপর। আমরাও ছাড়ব না। কিন্তু কষ্ট করতে হবে, অনেক কষ্ট! একতলা ছোটো বাসাটার উপর দিয়ে গুলি ছুড়ছে, ছুড়ছে...। সেই ছুটন্ত গুলির মধ্যেই নদীকে মায়ের কোলে রেখে বাবা বেড়িয়ে যায়। আর কোনো খবর নেই।

বাবা চলে যাবার পর মাসখানেকের মাথায় বাসায় আসে পাকিস্তানি ক্যাপটেন মোমেন, সঙ্গে কয়েকজন আর্মি আর সামনের বাসার দেলোয়ার মিয়া।

দেলোয়ার মিয়া পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করছে। লোকটা কয়েক বছর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে ভালো উর্দু বলতে পারে। সেই লোকটার মুখে দাড়ি। মুখে পান। পান চিবুতে চিবুতে মাকে বলে, তোমার স্বামী রেহান মিয়া কই? দেখি না অনেক দিন। আগে তো দেখতাম দিনরাত মুজিবুর মুজিবুর করত। এখন কই?

উনি গ্রামের বাড়ি গেছেন... মা ঘোমটা মাথায় দিয়ে বলে। কোলে নদী।

খে খে খে বিশ্রী শব্দে হাসে দেলোয়ার মিয়া, আমগো গরু ছাগল মনে হয়? কিছুই বুঝি না মনে করো। হুনো, আগামী পরশুর মধ্যে রেহানরে হাজির করবা, নাইলে... লোকটা কিংশুকের গলা ধরে, এক্কেরে শেষ করে দেবো। ঘরের মেঝেতে পানের পিক ফেলে মায়ের দিকে তাকায়, মনে রাইখো।

চলেন ক্যাপটেন সাব, হাসিমুখে সামনের দিকে এগোয় রাজাকার দেলোয়ার মিয়া। পিছন থেকে ক্যাপটেন যেতে যেতে হাতের লাঠি দিয়ে মায়ের ঘোমটা ফেলে দেয়। মা ভয়ে থরথর কাঁপে। আর বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে নদীকে।

ক্যাপটেন একটা রহস্যমাখা হাসি দিয়ে রুম থেকে দলবল নিয়ে চলে যায়। ঘটনার পর কিংশুক, মা আর নদী অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়, বাসায় থাকা একমুহূর্ত ঠিক না। রাতের অন্ধকারে কিংশুক, মা আর নদী বের হয়ে যায় বাড়ি থেকে। ওমা! কুমিল্লা শহর ছেড়ে একটু বাইরে আসতেই দেখতে পায় অনেক মানুষ গ্রামের পথ ধরে প্রতিবেশী দেশের দিকে ছুটছে। সেই দলে ঢুকে যায় ওরাও...। সারারাত হেঁটে সকালের পর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কমলাসাগর গ্রামে এসে হাজার হাজার বাঙালির দেখা পায়। বেশিরভাগই নারী, শিশু। পথে পথে মানুষের যে কি কষ্ট! খাওয়া নাই, পরা নাই, ঘুম নাই, পরনের কাপড় নাই...।

কিংশুকরা কুমিল্লা শহরে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে তাবুতে। লম্বা এক সারি তাবু টানানো। যেদিকে চোখ যায়, কেবল তাবু আর তাবু। এক একটা তাবুর এক একটা রুমের মধ্যে মা-বাবা পুত্র, কন্যা নিয়ে সাতজন আটজন মানুষ থাকছে। চারদিকে মানুষ পিঁপড়ার সারির মতো হাঁটছে...। কাঁদছে। কাশছে। জ্বরে ভুগছে। অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে। কাছেই বড়ো একটা পুকুর। পুকুরের পানির রং সবুজ ফ্যাকাসে। উপরে শ্যাওলা ভাসছে। সেই পানি খাচ্ছে শরণার্থীরা।

শরণার্থী শিবিরে এসে কিংশুক কী করবে ভেবে পায় না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। পুকুর পাড়ে দেখতে পায় চারাপাতি খেলছে চারজনে, শিবু কুমার হালদার, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আলীয়া ফেরদৌসী, হেমায়েত আলী হিমু। ওদের খেলার মাঝখানে কোমড়ে হাত রেখে দাঁড়ায় সে, আমিও খেলুম।

তুমি কেডা? জিজ্ঞেস করে বরিশালের হেমায়েত আলী হিমু।

আমি কুমিল্লার কিংশুক।

আমি জয়ন্ত, বাড়ি বাগেরহাট। জয়ন্ত নিজেই পরিচয় দেয়।

কিংশুক ঘুরে দাঁড়ায়, তোমার নাম কী?

আলীয়া ফেরদৌস। আমার বাড়ি পাবনা। পড়ি ক্লাস সিক্সে-ঘাড়ের উপর ঝুলে পরা চুল নাড়াতে নাড়াতে বলে আলীয়া।

কিংশুকের কাছে এসে দাঁড়ায় শিবু, আমি শিবু কুমার কুন্ডু। পড়ি ক্লাস ফাইভে।

বাড়ি কোথায়, বললে না তো?

বাড়ি নোয়াখালি- তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

আমি পড়ি এইটে।

ওরা বুঝে যায়, কিংশুক বড়ো।

শোনো তোমরা! সবাই তাকায় কিংশুকের দিকে।

বলো... ঘাড়ের চুলে আবার নাড়া দেয় আলীয়া ফেরদৌসী।

আমরা দেশ থেকে বিদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। কি সুন্দর আমাদের দেশটা। অথচ পাকিস্তানিরা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে আমরা ছোটো বলে কেউ যুদ্ধে নিতে চাইছে না। কিন্তু আমি যুদ্ধে যেতে চাই...। কিংশুকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরে হাত তোলে আলীয়া, আমিও যুদ্ধে যাবো তোমার সঙ্গে।

আমিও, হাত তোলে জয়ন্ত। আমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে, কাঁদতে শুরু করে জয়ন্ত।

জয়ন্তর কান্না সবাইকে আক্রান্ত করে, চোখ ভিজে আসে।

তাহলে কী করতে হবে আমাদের? প্রশ্ন করে শিবু কুমার।

চলো, আমরা পুকুরের ওই পাড়ে যাই। কিংশুক বলে, এখানে চারদিকে মানুষ আর মানুষ। বিষ্ঠার গন্ধ আসছে। গাছের উপর কাক। ওরা যে-কেনো সময়ে...

হ্যাঁ চলো।

বাংলাদেশের কুমিল্লা, বাগেরহাট, পাবনা, বরিশাল, পিরোজপুর, নোয়াখালি ছয় জেলার ছয় জন একসঙ্গে হেঁটে খোলা মাঠে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ওপার থেকে এসে ওদের সাথে যোগ দেয় দীপক। দীপক হাঁটে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জয়ন্ত, শিবু আর আলীয়ার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে।

দীপক এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করে কিংশুক, তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটো কেনো?

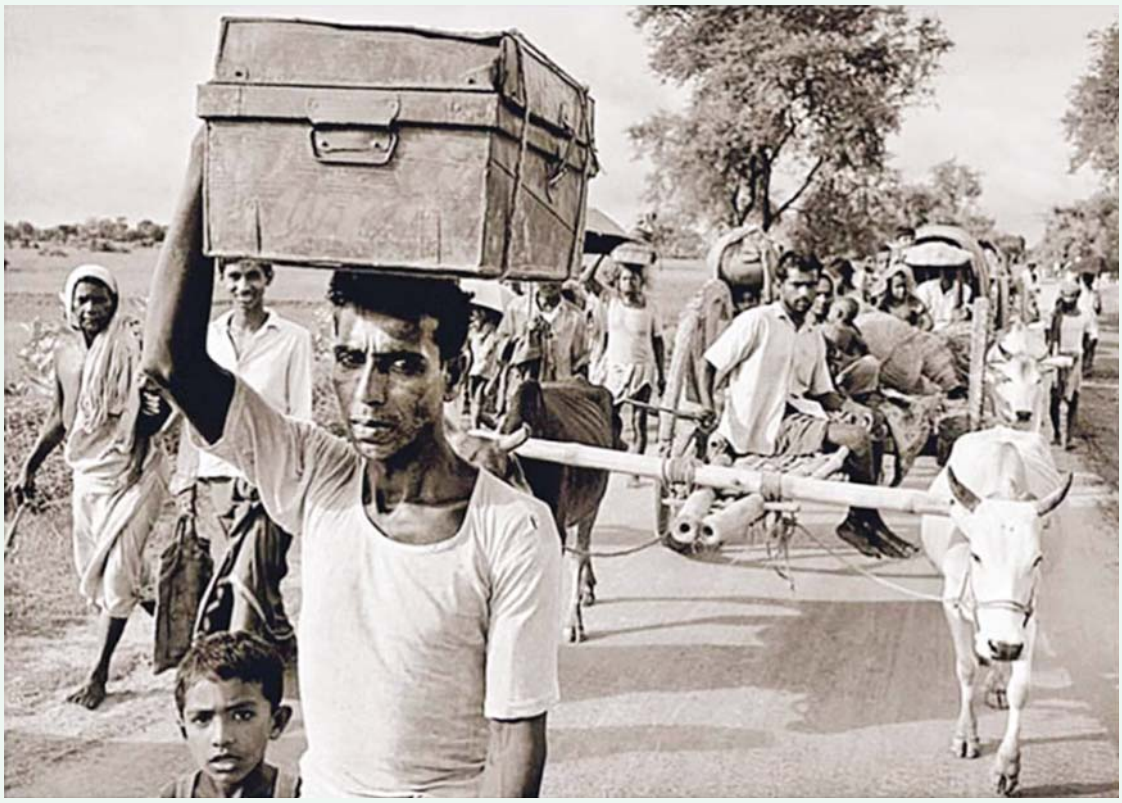

তুমি কেডা?

আমি কিংশুক। বাড়ি কুমিল্লা শহরে। পড়ি ক্লাস এইটে।

আমি দীপক খান। বাড়ি পিরোজপুরে, বরিশাল জেলায়। পড়ি ক্লাস সেভেনে পিরোজপুর জেলা স্কুলে। আমার বাবা ওবায়দুল হোসেন যুদ্ধে গেছে। হের লাইগা রাজাকার আর পাকিস্তানের সৈন্যরা আমাগো ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিছে। আমি গেছিলাম মাছ ধরতে বিলে। আগুন দেইখা মাছ ধরা বাদ দিয়া বাড়ি আহি। বাড়ি আইয়া দেখি, পুরো ঘর জ্বলতেছে। ঘরের মইধ্যে দিয়া মায়ের আর ছোটো বুইনের কান্দন ভাইসা আসে। আমি ঘরের মইধ্যে যাইতে চাইলাম, রাজাকাররা যাইতে দিল না। মোরে আটকাইয়া রাহে... হু হু করে কাঁদতে শুরু করে দীপক।

জয়ন্ত, আলীয়া, শিবু, কিংশুক, হিমুও কাঁদতে শুরু করে।

মাথার উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে যায়। দূরের রাস্তায় গাড়ির সাইরেন শুনতে শুনতে ওরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়।

খোঁড়াইয়া হাঁটি। রাজাকারগো হাত থিকা পালাইয়া আসার সময় জোরে দৌড় দিছিলাম, দৌড়ের সময় একটা গাছের গুঁড়ির লগে পা আটকে গেছিল। অনেক ব্যাথা পাইছিলাম। অনেক দিন হাঁটতে পারি নাই, এহেনে তো ওষুধও পাওয়া যায় না। হের লাইগা খোঁড়াইয়া হাঁটি, নিজের খুঁড়িয়ে চলার ব্যাখা করে দীপক খান।

তোমার মা এবং বোনের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আদ্র গলায় বলে কিংশুক।

কী সিদ্ধান্ত? জানতে চায় শিবু কুমার।

আমরা ছোটো, তাই বড়োরা আমাদের যুদ্ধে নেয় না। কিন্তু আমরাও দেশের সন্তান, বড়োদের মতো। আমাদের একটা কিছু করা দরকার। আমাদের স্কুল নাই.. পড়ালেখা বন্ধ। তোমরা কী বলো?

আমি যুদ্ধ করমু, হাত-পা টান টান করে বলে দীপক। আমি গুল্লি কইরা অগো মারমু..মাইরা গাছে টানাইয়া রাখমু। আমি যুদ্ধে যামু।

হিমুর দিকে তাকায়, হিমু তোমার বোনকে নিয়ে কী করবে? ওর বয়স কত? প্রশ্ন করে কিংশুক মিথুন।

তিন বচ্ছর।

অবাক সবাই। কিংশুক প্রশ্ন ছোড়ে, মাত্র তিন বছর?

মাথা নাড়ায়, হ, তিন বছর।

কিন্তু ও কীভাবে যুদ্ধে যাবে? নাম কী তোমার বোনের?

কুলসুম।

ও কীভাবে যুদ্ধে যাবে? তোমার মাথা খারাপ হইছে। কুলসুমকে মায়ের কাছে রেখে আমরা যুদ্ধে যাবো, কেমন? সবার দিকে চোখ রাখে কিংশুক।

কিন্তু আমার বোন কুলসুমকে ছাড়া যামু না.. গো ধরে হিমু।

হিমু, তুমি বুঝতে পারছ না.. আলীয়া বোঝাবার চেষ্টা করে, তোমার বোন কুলসুম তো ছোটো, কীভাবে যুদ্ধ করবে? ও কি হাঁটতে পারে?

জানি না...

মানে? তোমার বোন হাঁটে কি না, তুমি জানো না? হিমুর কাঁধ ধরে ঝাঁকা দেয় শিবু ।

মা, দাদি, আমি পাকিস্তানি আর্মি আর রাজাকারদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসার সময় পথে আমরা একটা আমগাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সেখানে আরো মানুষ হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। চারপাশ দিয়ে শত শত মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। কুলসুম ছিল দাদির কাছে। আমরা বিশ্রাম নিতে নিতে সবাই ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম থেকে উঠে কুলসুমকে আর পাইনি...।

অবাক কাণ্ড, দীপক একটুও কাঁদছে না।

কিন্তু শিবু, কিংশুক, জয়ন্ত, আলীয়া, হিমু হাউমাউ শব্দে কাঁদছে ত্রিপুরার শরণার্থীর ক্যাম্পের বাইরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে। কান্নার সুরে শোনা যাচ্ছে ওরা বলছে কুলসুম... কুলসুম... কুলসুম... ❑

শিশুসাহিত্যিক ও গল্পকার

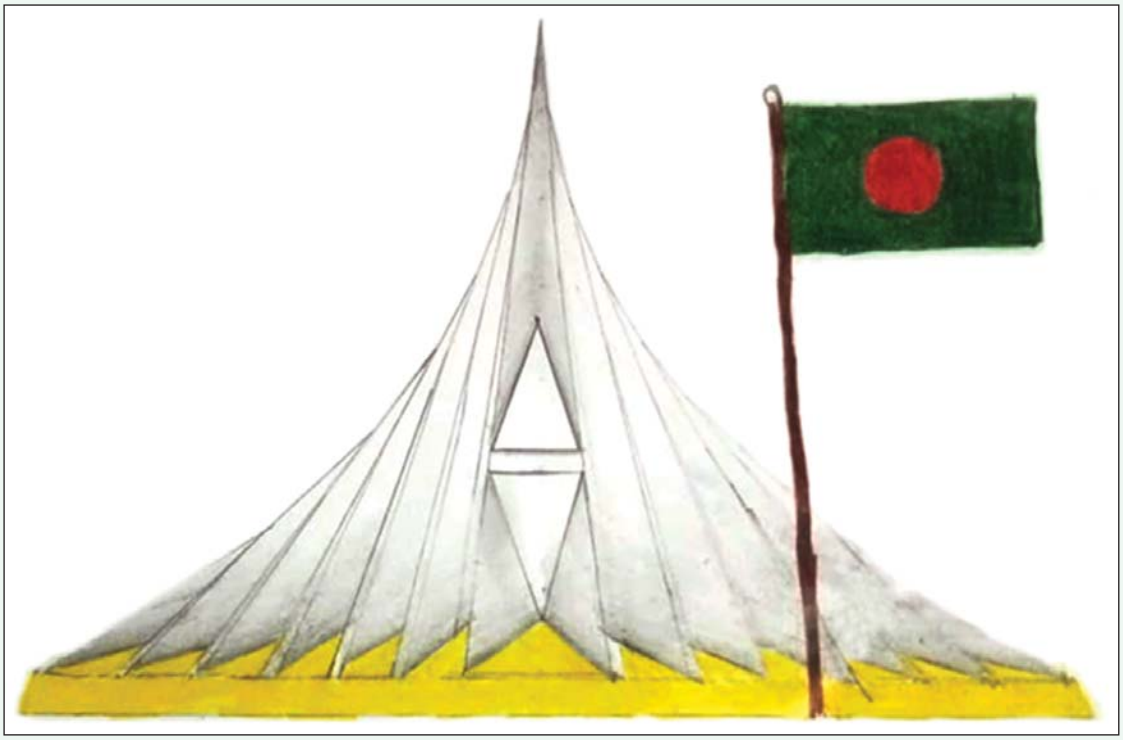

নাফিসা তাসনিম স্নেহা, শ্রেণি- কেজি ওয়ান, রোজবাড কিন্ডারগার্টেন স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

মুক্তিযুদ্ধ
আমাদের অহংকার

দেলওয়ার বিন রশিদ

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর। বিশ্ব মানচিত্রে উদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে কতিপয় কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল তা অনেক ত্যাগ, সংগ্রাম আর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে সেই স্বাধীনতার লাল সূর্য।

পৃথিবীর কোনো জাতিকে স্বাধীনতার জন্য এত ত্যাগ আর রক্ত দিতে হয়নি। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্রোত আর দুই লক্ষ মা-বোনের সর্বোচ্চ ত্যাগে পাওয়া আমাদের স্বাধীনতা, সবুজে লাল পতাকা। এ দেশের মাটি আর ধূলিকণায় মিশে আছে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত। সে ইতিহাস বড়ো করুণ, হৃদয় বিদারক।

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও পরে সেনাধ্যক্ষ রবার্ট ক্লাইভ দেশীয় কু-চক্রীদের হাত ধরে বিনা যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে, এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয়। পলাশির আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলো, সেই সাথে নতুন করে শুরু হলো স্বাধীনতার জন্য লড়াই। প্রথম দিকে নানা স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ করা হতে থাকে। ধীরে ধীরে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়, যা সিপাহি বিদ্রোহ নামে পরিচিতি পায়। এই সিপাহি বিদ্রোহই উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, যা বাংলার ব্যারাকপুরে সূচিত হয়। ইংরেজরা সিপাহি বিদ্রোহ দমন করে হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষকে ফাঁসি দেয়। কিন্তু তারপরও চলতে থাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের লড়াই। ফকির মজনু শাহ, মীর কাসিম, তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহসহ আরো অনেকের নাম এই বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রায় দুইশত বছর পর গোলামির শিকল ছিড়ে ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পেলো। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে জন্ম নিলো পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই দেশ। মুসলমান অধ্যুষিত থাকায় পূর্ববাংলা হলো পাকিস্তানের অংশ। পাকিস্তানের দুটি অংশ একটি পশ্চিম পাকিস্তান অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য হতে থাকে। পাকিস্তান যে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল, নানা অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডে তা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান নানাভাবে অবহেলিত হতে থাকল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় রাজধানী হলো করাচিতে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব হাজার মাইল। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি, সেনা, বিমান, নৌবাহিনী ও বিদেশি কুটনৈতিক নিয়োগের বেলায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চরমভাবে বৈষম্য দেখা দেয়। পনেরো ভাগের বেশি নিয়োগ পূর্ব পাকিস্তান পায় না। দিন দিন এই বৈষম্য বাড়তে থাকে। এ সময় আকস্মিক বাংলা ভাষার উপর নেমে আসে এক আঘাত। ১৯৪৮ সালে ২১শে মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা দিলেন 'উর্দু' হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।

শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন, যা ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনরত ছাত্র-তরুণদের মিছিলে গুলি চালায়। সেই গুলিতে শহিদ হলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। সারা বাংলায় ছড়িয়ে যায় আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয়ের প্রভা। ভাষা আন্দোলন যেন বাঙালিকে উজ্জীবিত করে তার কাঙ্খিত স্বপ্নে পৌঁছার লক্ষ্যে, বেজে উঠে স্বাধীনতার বাঁশি।

১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি তদানীন্তন পাক সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়। বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে যেতে হয়।

১৯৬৯ সালে ৫ই জানুয়ারি ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের ফলে ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্যদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্র-জনতার সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিভাবে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বঙ্গবন্ধুর দল ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয়ী হয়। কিন্তু এতে বিপত্তি ঘটে, বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শাসনকর্তা হবে তা পাকিস্তানিরা মেনে নিতে পারেনি। তৎকালীন পাক সামরিক প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণতান্ত্রিক বিধি অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায় এবং শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নেয়।

১৯৭১-এর ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করা হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। শুরু হলো বাঙালির অধিকার আদায়ের সর্বাত্মক সংগ্রাম। এল ৭ই মার্চ, ইতিহাসের অনন্য এক দিন, এদিন ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা নয়, এ যেন জনসমুদ্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন। তিনি বাঙালিদের প্রতি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। এ দিনের ঐতিহাসিক ভাষণে মহান বাঙালি কৃতীপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ-এদেশের করুণ ইতিহাস। এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস...। তিনি জনসমুদ্রে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

হীন কুচক্রী পাকিস্তানি শাসকগণ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে, কিন্তু নানা কৌশলে আলোচনা বানচাল করে রাতের আঁধারে বাঙালিদের উপর লেলিয়ে দেয় হিংস্র পাকসেনা বাহিনী। ২৬শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর শুরু হয় নির্মম নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন। পাক সেনারা মেতে উঠে

বাঙালি নিধনে, বাংলা দখলের নামে নয় মাস চালায় বাঙালিদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ শে মার্চ রাতেই গ্রেফতারের আগে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন। সে ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয় সর্বত্র। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।' বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় বাঙালিদের সংগ্রামের প্রেরণা দেয়, কৃষক শ্রমিক ছাত্র-জনতা এক হয়ে যুদ্ধে নামে, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর থানার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে গঠিত হয় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এই সময় স্থানটির নামকরণ করা হয় 'মুজিব নগর'। সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী হন।

নিয়মিত সেনাবাহিনী আর গণবাহিনীর সমন্বয়ে মুজিববাহিনী গঠিত হয়। যুদ্ধের জন্য পুরোদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। চলে সর্বাত্মক যুদ্ধ। স্বাধীনতার লড়াইয়ের যুদ্ধে রক্ত ঢেলে দিতে কৃষক শ্রমিক শিক্ষক ছাত্র-জনতা মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাতে থাকে। প্রতিরোধ আর সম্মুখ সমরে বীরের রক্তে ভাসল বাংলার খাল-বিল-নদী।

নয়টি মাস আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এ দেশের বীর সন্তানেরা লড়াই করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে বিজয়, বাংলার স্বাধীনতা, সবুজে লাল প্রিয় পতাকা।

বাংলার কাদামাটিতে আজও বীরের রক্ত লেগে আছে। আর সেই রক্ত মুহূর্তে মুহূর্তে ছড়ায় স্বাধীনতার সুবাস। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার, আমাদের স্বাধীনতার সৌরভ, আমাদের স্বর্ণাভ ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে চিরকালীন প্রেরণা, আমাদের চলার পথের আলো। ❑

প্রাবন্ধিক

বীরের জীবন দানে

শাফিকুর রাহী

আকাশগঙ্গায় মেঘের হ্রদে বিদ্যুৎও চমকালো
টিক্কা-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার দানবরা পালালো।
সে খুশিতে বাজল বাঁশি রোদেলা আকাশে
বিজয়ের আনন্দে কেতন-হাওয়ার ভেলায় ভাসে।
ত্রিশ লক্ষ শহিদ হলো বর্গি-দানব ত্রাসে-
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলা রক্তবানে ভাসে।

এখনো বঙ্গবন্ধু আমার লোকচক্ষুর আড়ালে
অন্ধকারে হিম্মৎ হাঁকায়-পদ্মার বজরা-পালে।
যুদ্ধ চলে আকাশ পথে হাটে-ঘাটে-মাঠে-
বিজয়ের ইতিহাস জানব জ্ঞান-বিদ্যাপাঠে।
বীরের বিভায় বীর তকমায় শত্রুদের বিনাশে—
বিশ্বের বিস্ময়-বীর বাঙালির বিজয়ের উল্লাসে।

মা-বোনের সম্ভ্রম আর বীরের জীবন দানে
মেঘলাকাশে সূর্য হাসে-জয় বাংলার গানে।
বাঁধনহারা বীর গেরিলা উল্কা হয়ে ছুটল
বিজয়ের আনন্দে তারা গোলাপ হয়ে ফুটল।
বীরের অমর আত্মত্যাগে সোনার বাংলা গড়ব
বিবাদ-বিভাজন তাড়াতে বীরের বেশে লড়ব।

আকাশ আমায় দেয় পাহারা বাতাস শোনায় গান
জাতির পিতার আদর্শেতে আমরা বলিয়ান।
বাংলাদেশের বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বরে—
স্বজনহারার রোদন বাজে-অন্তরে অন্তরে—
আপনহারার দুঃখ ভোলার শপথ ও সম্প্রীতি-
মুক্ত আলোয় স্বাধীন দেশে থাকবে না ভয়ভীতি।

বিজয় দিবসে গর্ব

স.ম. শামসুল আলম

গল্পটা শুরু যেভাবে, বলতে হয়ে যাই বাকরুদ্ধ
কেন হয়েছিল এই দেশটায় অমন মুক্তিযুদ্ধ?
কেন এত প্রাণ ঝরেছিল? বলা আমার জন্য কষ্ট
কেন পুড়েছিল এত বাড়িঘর? কত ফুল-ফল নষ্ট!

পশ্চিম-পাকি শাসকেরা এসে শাসন করেছে পূর্ব
স্বাধীনতা কেড়ে দেশটা শ্মশান– কী করে স্বাধীন ঘুরব?
ঘুরতে পারি না, উড়তে পারি না, বলতে পারি না কিচ্ছু
শাসনের নামে শোষণ করা সে-পশ্চিমা ছিল বিচ্ছু।

হিংস্র জন্তু তাড়াতে, বাঙালি উঠেছিল তাই গর্জে
পরাধীনতায় আর কতকাল? কুলাচ্ছিল না ধৈর্যে।
একাত্তরের সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু ভাষণে দিলেন যুক্তি
সংগ্রাম হবে, চাই স্বাধীনতা, চাই বাঙালির মুক্তি।

স্বাধীনতা-ডাক চেতনার কথা, ঘরে ঘরে বাজে তূর্য
বাঙালি এবার দেখতে মরিয়া বাংলাতে নবসূর্য।
এভাবেই শুরু মুক্তিযুদ্ধ, ন'মাসেই শেষ পর্ব
জয়ী হয়ে, স্বাধীনতা পেয়ে করি বিজয় দিবসে গর্ব।

ডিসেম্বরের লাল সূর্য

চন্দনকৃষ্ণ পাল

পঁচিশ বছর তিলে তিলে পুড়ে যাবার পর
আমার দেশের সব সম্পদ যায় অন্যের ঘর
বুকের ভেতর আগুন জ্বলে
চেপে রাখি কি কৌশলে!
৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু যখনই দেন ডাক
গর্জে ওঠে সাত কোটি মুখ 'ওরা নিপাত যাক।'

পঁচিশে মার্চ একাত্তরে
আগুন জ্বলে ঘরে ঘরে
লক্ষ মানুষ খুন করে ঐ হায়েনারা হাসে
দুঃখী আমার বাংলা মা যে চোখের জলে ভাসে
মায়ের চোখের জল কি ছেলে দেখতে পারে বল
লক্ষ ছেলে ওঠে দাঁড়ায় যদিও পা টলমল
টলমল পা স্থির হয়ে যায় অস্ত্র হাতে পেয়ে
গর্জে ওঠে লক্ষ ছেলে এগিয়ে যায় ধেয়ে।

পাকিস্তানি হায়েনারা হাবুডুবু খায়
রাজাকারের সন্তানেরা তাদের পাশে যায়
সর্বশেষ কামড় বসায় চৌদ্দ ডিসেম্বরে
দেশের সব সোনার ছেলের চোখ বেঁধে নেয় ধরে
সোনার ছেলের লাশ পড়ে রয়
সে স্মৃতি তো ভুলার নয়
সেই রক্তের সিঁড়ি বেয়ে সূর্য উঠে আসে
ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ লাল সূর্য হাসে।

জয় বাংলার জয়
লাল রক্তের সিঁড়ি বেয়ে বাংলা স্বাধীন হয়।

রক্ত দলিল

সাদ্দাম হোসেন

সাক্ষী আছে বাংলা বেতার 'মুক্তির সংগ্রাম'
মুক্তিকামীর বুকের মধ্যে 'শেখ মুজিবের' নাম।

দুরন্ত সেই বিকালবেলা
মাথার উপর রোদের খেলা
সাক্ষী আজও ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দান
সাক্ষী আছে মন জাগানো বাংলা ভাষার গান।

ঘোষক যিনি স্বাধীনতার
লিডার তিনি এই পতাকার
মুছতে পারে কেউ কখনো সত্য ইতিহাস?
স্বাধীনতার দলিল লেখক অগ্নিঝরা মার্চ।
স্বাধীনতার ঘোষণাটা অকাট্য এক দলিল
কেউ পারিনি চাপা দিতে নেকড়ে-শকুন-চিল।

পুড়িয়ে দেবে ? দাও তো দেখি!
মুছে দেবে ? সাহস দেখি!
পৃথিবীর সব কাগজ-দলিল পুড়িয়ে দেবে? দাও!
বুকের মধ্যে রক্ত দলিল পোড়াতে-জীবন নাও।

বুড়ো আঙুল

ধ্রুব নীল

‘গেল রে! বলটা একেবারে মরণ কুয়োয়। তুলব কী করে! খেলা ডিসমিস। ওই সবুজ, তুই ফেলেছিস, তুই তুলবি।’

শরিফুলের কথায় উশখুশ করছে সবুজ। তার কিক এই ফুটবলটা সোজা গিয়ে পড়েছে গভীর এক পরিত্যক্ত কুয়ায়। নিচে পানি থাকলেও কেউ জানে না কত গভীর ওই কুয়া।

মায়াপুর হাই স্কুলে পড়ে ওরা সবাই। কেউ এইটে তো কেউ টেনে। রতনও আছে দলে। সে হলো ‘দুধভাত পেলেয়ার’। টিংটিঙে সরু। জোরে বাতাস এলেও নাকি তার হাঁটতে কষ্ট হয়। পাওয়ারওয়ালা চশমা পরে। অবশ্য কেউ তার মাথায় গাট্টা মারে না। মারলে যদি আবার চশমা পড়ে যায়। তবে রতনের মাথা ভালো। পরীক্ষায় সব সময় ফার্স্ট। অঙ্কে তার সঙ্গে স্যারেরাও পারে না।

সবুজ মাথা চুলকে বলল, ‘কাক আর কলসির গল্পের মতো দেখব নাকি। সবাই মিলে কুয়োর ভেতর পাথর ফেলি। তাতে পানি উঠতে উঠতে বলটাও উঠবে।’

সবাই হেসে ওঠার আগে রতন সিরিয়াস গলায় বলল, ‘কুয়োর ব্যাস আর গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে কয়েকশ টন পাথর ফেলতে হবে। মায়ানগরের নদীর তীরে যত পাথর আছে তাতে কাজ হবে না।’

‘এখন উপায়?’

শরিফুল বলল, 'বড়ো দড়ি আর ঝুড়ি লাগবে। নিচে ফেলে বলটা তুলতে হবে।'

সবুজ বলল, 'কত বড়ো দড়ি? ঝুড়ি তো আমাদের ঘরে আছে।'

'কুয়াটা কত গভীর জানলে সুবিধা হতো। মাপব কী দিয়ে?'

রতন গেল কুয়ার কাছে। তুলে নিল একটা মাঝারি সাইজের পাথর। সবাই গোল হয়ে ঘিরে ধরল। রতন ইশারায় বলল, সবাই চুপ!

পাথরটা ফেলে আঙুলের কড়ায় সেকেন্ড গুনল। তিন সেকেন্ড পর কানে এল ঝুপ শব্দটা। এরপর কুয়োর পাশে শ্যাওলা পড়া মাটিতেই খড়ি দিয়ে ইংরেজিতে লিখতে লাগল সূত্র। ডি সমান হাফ জিটি স্কয়ার। রুট ওভার টুডি বাই জি...।

অঙ্ক করা শেষে সবাইকে বলল, কুয়াটা সাড়ে একশ তেত্রিশ ফুট গভীর। এরচেয়ে একটু বড়ো দড়ি বানালেই বলটা তোলা যাবে। তবে ঝুড়ির ভেতর একটা ইট দিতে হবে। তাতে ঝুড়িটা প্রথমে পানিতে ডুববে এরপর টান দিয়ে বলসহ ওঠানো যাবে।

এই হলো রতন। যে কারণে দুধভাত হলেও দলে সে জায়গা পায়। সেদিন বলটা ওঠানোর পর সন্ধ্যায় সবার হাতে ভরপেট সিঙাড়া খেয়ে বাড়ি গেল রতন।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটা বাজতেই হই হই কাণ্ড। রতনদের উঠোনে গোল হয়ে ফুল ভলিউমে রেডিও শুনছে বড়োরা সবাই। রতনের কানে ভাসা ভাসা কিছু কথা এল, 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়...।'

উঠোনে শরিফুল আর সবুজকেও দেখল। শরিফুলকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। 'বিরাট গ্যাঞ্জাম চলতেছে। স্কুল বন্ধ হবে। উর্দু ক্লাস করতে হবে না। কী মজা।'

পরের প্রায় এক মাস মায়াপুরে কিছুই হলো না। এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে খবর এল পাকিস্তানি সেনারা রানীনগর উপজেলা ঘিরে ফেলেছে। জিপ গাড়ি নিয়ে এসেছে। হাতে বন্দুক। সবাইকে নাকি মেরে ফেলছে। রতনের গ্রামের কয়েকজন পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কারণ গ্রাম থেকে বের হওয়ার সোজা পথটা রানীনগর দিয়েই। একটা ব্রিজ পার হতে গিয়ে ধরা পড়েছে ওরা। অন্যদিকে আছে নদী। যারা পেরেছে তারা আগেই নৌকা সব নিয়ে চলে গেছে।

রতন, শরিফুল ও সবুজের বাবা-মাসহ মায়াপুরের সবার মুখ শুকিয়ে কাঠ। এভাবে মানুষ মানুষকে মুড়িমুড়কির মতো মেরে ফেলতে পারে সেটা তারা ভাবতেও পারছেন না।

'রতন! রানীনগরের খবর পেয়েছিস? সব তো শেষ।'

রাতে জানালার কাছে ফিসফিসিয়ে বলল শরিফুল। সঙ্গে সবুজও আছে। সে নাকি কদিন আগে রাতের আধারে ব্রিজ পার হয়েছিল। খবর পেয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দেশে। অনেকে নাকি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু গ্রামের কারো কাছে বন্দুক নেই।

শরিফুল বলল, 'মিরাজ ভাই একটা পানসি নৌকায় নদী পার হয়ে এসেছে। তার কাছে খবর আছে। একটু পর মিটিং হবে।'

রতনদের উঠানেই হয় যাবতীয় মিটিং। সবার কথা বলাবলির মাঝে মিরাজও হাজির। বলল, 'মিলিটারিরা এই গ্রামে আসবে কাল। সব নাকি জ্বালিয়ে দেবে।'

রতনের মুখে ভাবান্তর নেই। যত চিন্তা সব চলে মাথার ভেতর। সবার কথাবার্তা শুনছে মন দিয়ে।

মিরাজ জানালো, 'ওদের কয়েকটা জিপ নষ্ট হয়ে গেছে। সম্ভবত তেল শেষ। তবে শুনলাম সকাল নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে। এরপরই ব্রিজ পেরিয়ে মায়াপুর।'

'ব্রিজটা ভাইঙা ফেলা যায় না?'

জয়নাল মুন্সির কথায় বাকিরা চুপ। বুদ্ধিটা ভালো। প্রশ্ন হলো ভাঙবে কী দিয়ে? হাতুড়ি, শাবল নিয়ে ব্রিজের কাছে যাওয়ার আগেই তাদের মেরে ফেলবে। কারণ ব্রিজের মাঝে নাকি দুজন পাকিস্তানি মিলিটারিকেও দেখা গেছে।

শরিফুল তার গুলতি দিয়ে অন্ধকারে এদিক-ওদিক নিশানা করছে। যেন শত্রু এলে এটা দিয়েই যুদ্ধ করবে। তার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল রতন।

এমন সময় মিরাজ বলল, 'আমার কাছে দশটা হাতবোমা আছে। বেশ পাওয়ারফুল বোমা। এর

কয়েকটা মারতে পারলে ব্রিজটা ভাঙবে। এমনিতেই তো নড়বড়ে।'

সবুজ বলল, 'ব্রিজের কাছে যাব কী করে? কত দূরে যাব? আর দূর থেকে ছুড়লে যে বোমাগুলো ব্রিজেই পড়বে সেটার গ্যারান্টি কী?'

মিরাজ বলল, 'ব্রিজের আগে একটা জঙ্গলের মতো আছে। সেখানে বট আর আমগাছ আছে। কিন্তু ওটার ওপর উঠে হাত দিয়ে বোমা মারা সম্ভব নয়। অতদূর ছুড়তে পারব বলে মনে হয় না। তার ওপর দুজন মিলিটারি পাহারাও দিচ্ছে।'

এরপর সবাইকে অবাক করে রতন বলল, 'আমি যাব ওই জঙ্গলে। গাছে উঠতে হবে।'

এরপর বন্ধুদের দেখিয়ে বলল, 'সঙ্গে তোরাও চল। আমি গাছে উঠতে জানি না। একা ভয় করবে। আর ব্রিজের রেলিংয়ে যে বাঁশগুলো লাগানো আছে সেগুলো সিরাজ কাকা বেঁধেছিলেন না? কত ফুট লম্বা ছিল বাঁশগুলো কাকা?'

সিরাজ আমতা আমতা করে বললেন, 'ফুটের হিসাব তো জানি না বাবা। আমার হাতের পনেরো হাত করে ছিল পইত্যেকটা।'

রতন সঙ্গে সঙ্গে স্কেল এনে মেপে ফেলল সিরাজ মিয়ার হাত।

'ষোলো ইঞ্চি হাত। তার মানে প্রতিটা বাঁশ দুইশ চল্লিশ ইঞ্চি। শরিফুল তুই গনি মিয়ার দোকান থেকে শক্ত দেখে তিন ইঞ্চি রাবারের একটা বড়ো মজবুত গুলতি বানিয়ে আন। আর ওজন মাপার একটা দাঁড়িপাল্লাও লাগবে।'

গনি মিয়া আর শরিফুল দুজন একসঙ্গেই দৌড় দিল।

রতনের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, তার কথায় কান না দিয়ে পারল না কেউ। তবে গাছে উঠে সে কী করবে আর বাঁশের মাপ জেনে কী হবে জানতে চাইল না কেউ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুলতি আর দাঁড়িপাল্লা হাজির। মিরাজের কাছ থেকে নিয়ে বোমাগুলোর ওজন

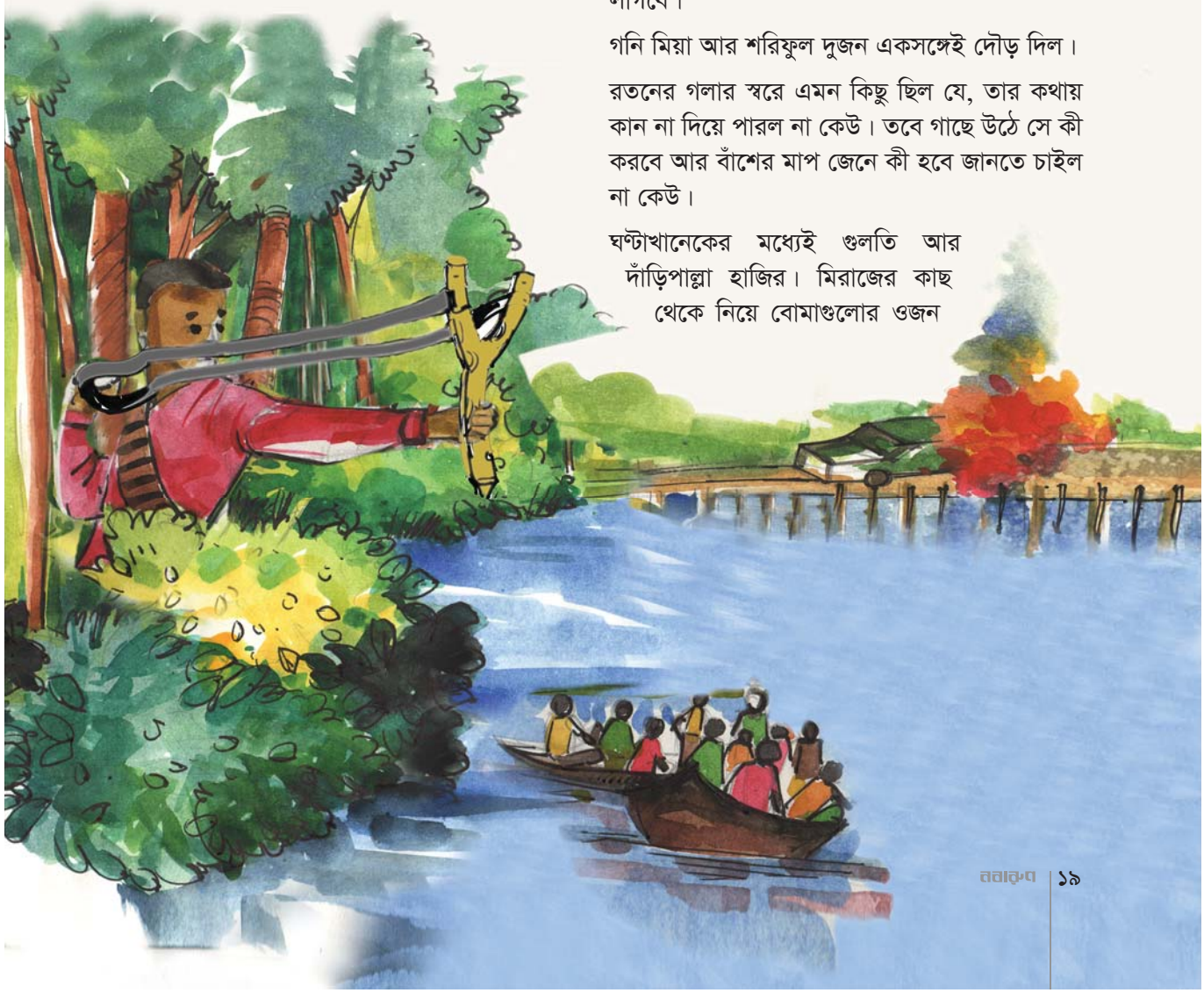

বের করল রতন। প্রতিটার ওজন সাড়ে চারশ গ্রাম। খাতায় সব লিখে নিচ্ছে রতন।

নতুন করে বানানো গুলতির সাইজটা দশাসই। তবে বড়ো প্রশ্নটার উত্তর পাচ্ছে না শরিফুল ও অন্যরা। গুলতিতে বোমা রেখে ব্রিজ বরাবর ফেলবে কী করে? বোমা জায়গামতো না পড়লে তো মহাবিপদ।

রতন বলল, 'আগে যেতে হবে জঙ্গলে। গাছে উঠব। ওই গাছ থেকে ব্রিজ কত ফুট দূরে সেটা মাপতে হবে।'

রতনের কথার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই কারও। টিংটিংয়ে চশমা পরা ছেলেটাই যেন এখন গ্রামের বিরাট নেতা।

গাছের নিচে চুপিসারে দাঁড়িয়ে গ্রামের গোটা দশেক মানুষ। দুই লাফে একটা মাঝারি দেখে আমগাছে চড়ল সবুজ। রতন গাছে চড়তে জানে না। সবুজই টেনে তুলল ওকে। চাঁদের আলোয় দূরের ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

এবার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে খাঁড়া করে টান টান করে হাত বাড়াল রতন। বন্ধ করল বাঁ চোখ। বুড়ো আঙুলের একটা প্রান্ত রেখেছে ব্রিজের রেলিংয়ে বাঁধা বাঁশের এক প্রান্তে। এরপর বাঁ চোখ বন্ধ করে মেলল ডান চোখ। বুড়ো আঙুলটাও যেন দুম করে সরে গেল ডানে। এবার আঙুলটাকে দেখা গেল বাঁশের একেবারে ডান প্রান্ত বরাবর। মুখে হাসি ফুটল রতনের। একই কাজ কয়েকবার করে নিশ্চিত হলো। খাতায় আর লিখতে হলো না। মুখেই মুখেই গুণ করল। 'দুইশ চল্লিশ গুণ দশ সমান দুই হাজার চারশ ইঞ্চি সমান দুইশ ফুট। এখান থেকে ব্রিজটা দুইশ ফুট দূরে!'

গ্রামের লোক হাততালি না দিলেও সবার চোখ চকচক করে উঠল।

'এবার লাগবে সাড়ে চারশ গ্রাম ওজনের পাথরের টুকরো'। ঘোষণা দিল রতন। শুরু হলো খোঁজ খোঁজ। নদীর পাড়ে ছুট সবুজ। চটের ব্যাগে পাথর বোঝাই করে ফিরে এল। সেখান থেকে বেছে বেছে ওজন করে কয়েকটা নিল রতন।

এরপর ডাক পড়ল শরিফুলের। গুলতির রাবারের নিচে মোটা করেই চামড়ার টুকরো বেঁধেছে ও। তাতে গোলগাল পাথর ভরে সহজেই ছোড়া যাবে।

রাবার টেনে বড়ো একটা পাথর দূরে ফেলল শরিফুল। রতনের কথামতো একদম নব্বই ডিগ্রি কোণ করে। কতটুকু রাবার টেনে আনল সেটা স্কেল দিয়ে নিখুঁতভাবে মেপে নিল রতন। গুলতি থেকে ছুটল পাথর। পাথরটা কতদূর গেল সেটাও মেপে নিল।

এদিকে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ওসমান ও তার স্ত্রীর বানানো চা-নাশতা খেয়ে ঘুম কেটে গেল সবার।

দশমবারের মতো গুলতি টেনে ছুড়ল শরিফুল। কত ইঞ্চি টানলে কত ফুট দূরে গিয়ে পড়ছে পাথরটা সেটা লিখতে লিখতে রতন একটা হিসাব পেয়ে গেল। শরিফুলকে টানতে হবে গুনে গুনে বাইশ ইঞ্চি।

কিন্তু ইঞ্চির হিসাব মনে রাখতে পারবে না শরিফুল। সহজ বুদ্ধি পেল রতন। গুলতির রাবার যখন শরিফুলের ঠিক নাক বরাবর আসবে তখনই যেন সে থেমে যায়। তাতেই কাজ হবে। আরও তিনবার প্র্যাকটিস করে শরিফুল অবাক হলো, রতনের কথাই ঠিক!

সে রাতে মায়াপুর গ্রামের লোকজন ব্রিজের দুইশ ফুট দূরের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য। শরিফুল গুলতি হাতে গাছের ডালে গেঁড়ে বসল। তার ঠিক পেছনে বোমার থলে হাতে মিরাজ। বড়ো করে শ্বাস নিল শরিফুল। আলতো করে বোমাটাকে গুলতিতে ধরে টেনে আনল নাক পর্যন্ত। ব্রিজ বরাবর তাক না করে রতনের কথামতো একদম নব্বই ডিগ্রি সোজা ধরেছে। বাতাসের গতি কমতেই ইশারা দিল রতন। গুলতি ছুড়ল শরিফুল।

প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল ব্রিজ। বাইশ ইঞ্চি মাপে ভুল হলো না শরিফুলের। দশটা বোমার মধ্যে আটটাই পড়েছে জায়গামতো। তাতেই ব্রিজ ভেঙেচুরে একাকার। টহল দেওয়া দুই পাকিস্তানি সেনার কী দশা সেটা জানার দরকার হলো না কারও। জিপ তো দূরে থাক, লাফিয়েও কেউ পার হতে পারবে না ওই ব্রিজ। তারচেয়েও বড়ো কথা, বিরাট কোনো সশস্ত্র প্রতিরোধ হচ্ছে ভেবে ওই রাতেই রানীনগর ছেড়ে পালিয়ে গেল হানাদার পাকিস্তানি সেনারা। ❑

সাংবাদিক, কালবেলা পত্রিকা

গল্প

বাবার রেডিও

মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

বাবা বিকেলে তার রেডিওটা একটু থেব্বা দিল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে হয়েছে রেডিওটার। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ব্যাটারি খায়। রেডিওটার কী খাই খাই রোগ ধরেছে নাকি!' আপন মনে বিড়বিড় করে বাবা। আমি পাশ থেকে বাবার কথা শুনি। থেব্বা দেওয়া রেডিওটা আবার হাতে তুলে নেয়। হাতে নিয়ে আবার বিড়বিড় করে। বলে,'এ্যাই রেডিও তুই এত যন্ত্রণা করিস কেন? তোর যন্ত্রণায় তো কোনো খবরই শুনতে পাচ্ছি না। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। ঘন ঘন খবর শুনতে হবে। এরকম সময় যন্ত্রণা দিলে চলে? শেখ সাহেব নাকি পাকিস্তানিদের সাথে আলোচনায় বসেছিল। মুজিব-ইয়াহিয়ার সেই আলোচনা পণ্ড হয়ে গেছে। এ খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আলোচনার সুফল পাওয়া যায়নি। তাহলে এখন কী হবে?' এই প্রশ্ন করেই থেমে যায় বাবা। একটু পরে আবার বলে, 'যাহ্, তোকে এসব বলে তো লাভ নাই। তুই তো একটা রেডিও। তুই তো আর কথা বলতে পারিস না। অন্যের কথা প্রচার করিস। এখন তো সেটাও পারছিস না। যাই ব্যাটারি নিয়ে আসি। তোকে সচল করি। শেখ সাহেব আবার কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে!' এরপর বাবা রেডিওটা যত্নসহকারে তুলে রাখল। রাখার পর বাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সে সময়ে আমি বাবার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, ' ব্যাটারি আনতে যাচ্ছ?'

- হুম।

- বাবা, তুমি যে বললে শেখ সাহেব আলোচনায় বসেছিল। কীসের আলোচনা বাবা?

- আমাদের অধিকার আদায়ের আলোচনা।

- সেগুলো কী বাবা? জানতে চাই আমি।

- শুনলাম মুজিব-ইয়াহিয়ার সেই আলোচনা ভেঙে গেছে। এখন একটাই দফা একটাই দাবি হবে। আর তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বাবার কথার মাথামুণ্ডু কোনোটাই ঠিকমতো বুঝলাম না। আমাকে ভালো করে বোঝার সুযোগ না দিয়ে বাবা বাজারে চলে গেল।

আজ ক্যালেন্ডারে তারিখ ২৫শে মার্চ ১৯৭১, বৃহস্পতিবার। একা বসে আছি। একটু আগে যে

বাবা বাজারে চলে গেল ব্যাটারি আনার জন্য তারপর আর ভালো লাগছে না। কেন ভালো লাগছে না এর কোনো কারণও খুঁজে পাচ্ছি না। বিকেলটা কেন জানি চারিদিকে নীরব হয়ে গেছে। মা'র দিকে তাকাই। মা'র চোখে-মুখে ভীষণ উৎকণ্ঠার ছাপ। দাদা ঘরে বসে আছে। দাদার মুখটাও শুকনো শুকনো। আমার নিজেরও বুকটা কেন জানি কেঁপে কেঁপে উঠছে অজানা আতঙ্কে। দাদার কাছে ছুটলাম। বললাম বাবার কাছে জানা সেই আলোচনার কথা। দাদা অকপটে বললেন, আমরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে বরাবরই অবহেলিত সে কথা। বললেন, ১৯৬৬ সালের সেই ছয় দফার কথা। শেখ সাহেবের নির্বাচনে জেতার কথা। দাদার কথা শুনে আমার একটা ধারণা অর্জন হলো। জন্ম নিলো দেশের প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা। দাদার সাথে গল্প করতে করতে রাত হয়ে গেল। বাবা তখনো ফেরেনি।

বাইরে আগুন আগুন চিৎকার শোনা গেল। সাথে মানুষের হাহাকার। দৌড়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম আশেপাশে নয়। পাশের পাড়ায় আগুন লেগেছে। সেই আগুনের লেলিহান শিখার কাঁপা কাঁপা আলো এসে পড়ছে এই পাড়ায়। আকাশটা যেন হলুদ-লালের মিশ্রণে যে রং তৈরি হয় সেই রকম আলো তৈরি হয়ে আলোকিত হয়ে আছে। মানুষজনের হাহাকার চিৎকার আরও জোড়ালো হচ্ছে। আমি ওই পাড়ায় দৌড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পানি ঢেলে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। মা'র অনুমতি নেওয়ার জন্য বাড়িতে ঢুকব এমন সময় মানুষজনের দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম ওই পাড়ার লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এদিকেই আসছে। আগুন লাগলে মানুষজন আগুনের দিকেই ছুটে তা নেভানোর জন্য। ব্যতিক্রম দেখছি আজকে। আমি যেন বিদ্যুৎ চমকানোর মতো চমকে উঠলাম। ওই পাড়ার মানুষজন আগুন না নিভিয়ে দৌড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পালাচ্ছে কেন? আমি থ হয়ে তাদের

পলায়ন যাত্রা দেখতে থাকলাম। কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ চেষ্টা এজন্য যে, কেউ দম ফেলানোর মতোও স্থির হচ্ছে না। ছুটছে তো ছুটছেই। ছুটতে থাকা মানুষজন থেমে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে এমন সময় তাদের নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে কে যেন আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পারলাম ওটা বাবা ছিল।

বাবা ঘরে ঢুকেই তার রেডিওটা নিলো। রেডিও নিতে নিতে বলল, তুই ওখানে কী করতেছিস বাবা? মিলিটারি এসেছে। মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

মাকে বললেন, মিলিটারিরা সব তছনছ করে দিচ্ছে। তুমি জেসমিন আর রাজুকে নিয়ে পিছনে বাংকারে চলে যাও। মা অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলেন। আমার হাতে কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো খাবারের গামলা আর পানির জগ দিয়ে বললেন, 'রাজু, আয় বাবা।'

মা রাজিনাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আমি মাকে ফলো করতে শুরু করলাম। দেখলাম বাবা আর দাদা আমার পিছনে। খুব অল্প সময়ে আমরা আমাদের বাড়ির পিছনে চলে আসলাম। এরপর মাটির নিচে একটা বাংকারে ঢুকে গেলাম। বাবা যে এই বাংকার কবে তৈরি করেছেন তা আমি জানি না। এখনকার পরিস্থিতি যে ভালো না তা বুঝতে পারছি। বাবার আচরণ, গ্রামবাসীর পালিয়ে যাওয়া, আগুনের লেলিহান শিখা, মানুষের চিৎকার তা বোঝাতে পেরেছে আমাকে। এরকম পরিস্থিতি যে হতে পারে বাবা বুঝি আগেই টের পেয়েছিলেন। না হলে এই বাংকার করে রাখেন!

আমরা সবাই বাংকারে নীরব হয়ে চুপচাপ বসে আছি। আমার ছোটো বোন জেসমিনও দেখি চুপ করে বসে আছে। মাটির নিচে বাইরের কোনো চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ আসছে না। বাংকারে থেকে মনে হচ্ছে বাইরের পরিবেশটাও আমাদের মতো নীরব-নিথর হয়ে আছে। আসলে তো বাইরের পরিবেশ যে অশান্ত তা দেখেই এসেছি।

বাবা আমার দাদাকে বললেন, 'আব্বা, শেখ সাহেব কি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন কি না।' দাদা চুপ করে বসে রইলেন। কিছু বললেন না। বাবা আবার বললেন, 'নিশ্চয়ই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। নইলে কী আর পাক বাহিনীরা এভাবে অতর্কিত হামলা করে।'

বাবা তার রেডিও বের করলেন। নতুন ব্যাটারি লাগালেন রেডিওতে। মাটির নিচে রেডিও সেন্টার ধরল ঠিকই। তবে শ্ শ্ শ্ শব্দ করতে থাকল।

মা জেসমিনকে ভাত খাওয়ানোর জন্য প্লেটে ভাত নিলেন। জেসমিন বলল, 'আমি ভাত খাব না। আমি ভাত খাব না।'

মা বললেন,' মিলিটারি আসতেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নইলে মিলিটারি ধরে নিয়ে যাবে।' জেসমিনকে ভয় দেখানোর জন্য মা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখ তো রাজু বাইরে মিলিটারি আসছে কিনা।'

এই কথা শুনে আমি মাটির সিঁড়ি দিয়ে বাংকারের মুখের কাছে এগিয়ে গেলাম। না, জেসমিনকে ভয় দেখানোর জন্য না। পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য গেলাম। তাতেই জেসমিন ভয় পেয়ে গপাগপ ভাত খেতে শুরু করল।

বাংকারের মুখ দিয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করলাম। আগুনের লেলিহান শিখার আলোয় এখনো আলোকিত আকাশ।

বাইরে বন্দুকের ড্রা ড্রা ড্রা শব্দ ভেসে আসছে। ভয়ে নিচে নেমে গেলাম। বাবাকে বললাম, বাইরের পরিস্থিতি।

বাবা বলল, 'কাল দেখি আমার রেডিও কী বলে। তুমি তৈরি থেকো রাজু। সেরকম হলে আমরা বাপ-ছেলে কালকেই রওয়ানা দিব।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম না কোথায় রওয়ানা দেবো। কারণ বাবা কোথায় যাওয়ার কথা বলেছে তা আমি বুঝে গেছি। দেশকে মুক্ত করার জন্য তো যেতেই হবে।

রাতটা গেল আমাদের নির্ঘুম। ভোর হলো। বাবা আর আমি রেডিও নিয়ে বসে আছি কিছু একটা শোনার জন্য। ❑

গল্পকার

exi‡k©`i mvZKvnb

মাহমুদুল হাসান খোকন

বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় ও স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় এবং বিরল ঘটনা। এ যুদ্ধে যে সব সাহসী ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের আত্মদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে তারা আজ বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে দেশের সর্বস্তরের আপামর জনসাধারণ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কোনো পিছপা হননি। লাখো লাখো প্রাণের কাছে বাংলাদেশ আজও চিরঋণী। পরবর্তীতে সে সব বীর শহিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। সবচেয়ে বেশি মর্যাদা প্রদান করা হয় বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়ে। তবে মাত্র সাতজনকে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার কারণে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ সম্মাননা হলো মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য বীরত্বে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক। যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস ও আত্মত্যাগের নিদর্শন স্থাপনকারী যোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ সেরা সর্বোচ্চ পদক দেওয়া হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকে বীরত্বের পরিচয় দিলেও বিচার বিশ্লেষণে শহিদদের মধ্য থেকে মাত্র সাতজন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের ক্রমানুসারে আরো তিনটি সামরিক পদক ঘোষণা করা হয়। যা- বীর-উত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক। এই সম্মানিত পদকগুলো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরই দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই

ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে এই পদকপ্রাপ্তদের নাম যথারীতি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী বীরত্বের ভূমিকা রাখা সেই সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ হলেন-বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ। অতি সংক্ষেপে এই বীরশ্রেষ্ঠদের পরিচয় তুলে ধরার সামান্য প্রয়াসমাত্র।

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপটেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

১৯৪৯ সালের ৭ই মার্চ বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার। ১৪ই ডিসেম্বর ভোরে শত্রুপক্ষের একটি গুলি জাহাঙ্গীরের কপালে বিদ্ধ হলে তিনি শহিদ হন। এ মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের কারণে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে।

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

জন্ম ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আব্বাস আলী মণ্ডল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অক্টোবরের ২৮ তারিখে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হামিদুর রহমানের মৃতদেহ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমের ছড়া গ্রামে দাফন করা হয়। পরে ২০০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হামিদুর রহমানের দেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করে। ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে ঢাকার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

১৯৪৭ই সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাবিবুর রহমান। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ১৬ই এপ্রিল শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন সিপাহি মোস্তফা কামাল। একপর্যায়ে তাঁর মেশিনগানের গুলি ফুরিয়ে গেলে শত্রুর গুলিতে শহিদ হন তিনি।

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার বাঘচাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা আজহার পাটোয়ারী। তিনি ১৯৭১ সালের এপ্রিলে যোগ দেন স্বাধীনতা যুদ্ধে। যথারীতি যুদ্ধ চলা অবস্থায় ১০ই ডিসেম্বর দুপুর ১২টার দিকে অনেক উঁচু থেকে তিনটি জঙ্গি বিমান হামলা চালালে বিধ্বস্ত গানবোটে মারাত্মকভাবে আহত হলে সাঁতরে তীরে আসলেও স্থানীয় রাজাকারদের হাতে শহিদ হন এই বীর সেনানি।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান

১৯৪১ সালের ২৯শে অক্টোবর পুরান ঢাকার ১০৯ আগা সাদেক রোডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মৌলভী আবদুস সামাদ। ২৫শে মার্চের কাল রাতের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২০শে আগস্ট সকালের দিকে করাচির মৌরিপুর বিমানঘাঁটি থেকে একটি জঙ্গি বিমান ছিনতাই করেন। কিন্তু বিমানে থাকা অন্য পাকিস্তানি পাইলটের সাথে ধস্তাধস্তির ফলে বিমানটি ভূপাতিত হলে তিনি শহিদ হন। ২০০৬ সালের ২৩শে জুন মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২৫শে জুন শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ

১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মেহেদী হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৮ই এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙামাটি- মহালছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানি শত্রুদের স্পিডবোটে স্বশস্ত্র হামলা চালালে স্পিডবোট ডুবে বেশকিছু শত্রু ঘায়েল হয়। কিছু বুঝে

উঠার আগে পিছনে দুটো লঞ্চ থেকে ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে। ফলে মর্টারের ভারী গোলা এসে পরে আব্দুর রউফের উপর। শহিদ হন এই বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ। ১৯৫৯ সালের ১৪ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর-এ যোগদান করেন। এরপর তিনি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭১সালে যশোর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ৮নং সেক্টরে ১৯৭১-এ র ৫ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে অনবরত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এতে গুলিবিদ্ধ হন নূর মোহাম্মদ। তবু মনোবলের সাথে যুদ্ধ করতে থাকলে একপর্যায়ে গুলি ফুরিয়ে যায়। শত্রুরা বুঝতে পেরে বেয়নেটের নির্মম আঘাত হানলে শহিদ হন এই বীরশ্রেষ্ঠ। বীরশ্রেষ্ঠ, বীর-উত্তম, বীরবিক্রম ও বীর-প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ছাড়াও বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে আরও অনেক নাম না জানা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমরা সকলে চিরঋণী হয়ে আছি। একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিতে গিয়ে যারা নিজে প্রাণ বিসর্জন করে গেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ❑

প্রাবন্ধিক

বীরদের ফিরে আসা

রহিমা আক্তার মৌ

ঝোপের ভেতর পেট সমান পানিতে নেমে চুপ করে আছে সাহানারা বেগম সানু। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা এই ভাবে। সময় হিসাব করার ঘড়ি ছিল না ওর কাছে, কিন্তু মাথার উপরের সূর্য আর নামাজের আজান হিসাব করেই বলেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা হবে। হাত-পা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীরের চামড়ার উপরে একটা পিচ্ছিল আস্তর পড়েছে বউ-শাশুড়ি দুজনের। জীবন বাঁচানোর চেয়ে হয়ত ইজ্জত বাঁচাতেই এই কঠিন সময় পার করা ওদের। ওদের মতো অনেকের অবস্থাও এমন।

১৯৭১ সালের শেষের দিক, অন্যদিনের মতো সানু রান্না বসিয়েছে চুলায়। শাশুড়ি সবজাহান বেগম কিছু পেঁয়াজ, মরিচ, সবজি কেটে দিয়ে সানুকে বলেন-

- ভুঁইয়ার ঝিঁ, সব তো গোছাই দিচি, আইজ তুঁই নিজেই রাঁধো। আঁই ইক্কিনি বড়ো বাইত যাই। হুর ঘরের ছোডোকাগুর নাকি শরিল খারাপ, দেই আই।

সানু নিজের কাজে মন দেয়। শুঁটকি দিয়ে এলিচা শাক রান্না করছে। ভাত, ডাল আর আলু ভাজি রান্না প্রায় হয়ে আসছে। ঠিক সেই সময়ে সবজাহান বেগম চিৎকার দিতে দিতে দৌড়ে এসে রান্নাঘরের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে। দম ফেলতে ফেলতে বলেন-

- ভুঁইয়ার ঝিঁ, ভুঁইয়ার ঝিঁ তুঁই গড়ের ভিতর নামি যাও, হানিত হলাই থাও। হুরা গেরামে মাতম হড়জে

ফাকিস্তানি শয়তানরা নাকি আইতাছে। রান্না থুইয়া সানু দৌড়ে যায় গড়ের দিকে। সবজাহান বেগম শুঁটকি তরকারির পাতিল গড়ের দিকে ছুঁড়ে মারে। বালতিতে থাকা পানি ঢেলে দেয় চুলার আগুনে। ভাত আর অন্য তরকারির পাতিল ঘরের কোণায় রেখে উপরে পাটের বস্তা দিয়ে রাখে। এই ফাঁকে সানু ঝোপের ভিতর পানিতে নেমে যায়। সবজাহান বেগম উঁকি দিয়ে বউকে দেখে, বলে -

- হানি তো অল্প, তুঁই আঁড়ু মারি বই থাও। তাইলে গলা হমান হানি থাকব। আঁইও আইতাছি, আঁই ডাকলেই উডি আইবা। আর কেউ ডাকলে আইবা না কই দিলাম। আর নড়বাও না।

মুখোশ পরা ৩/৪ জন লোক আসে সরাসরি সবজাহান বেগমের ঘরেই। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে ঘরের এদিক-ওদিক পিটাইয়া চলে যায়। ঝোপের ভেতর থেকে শাশুড়ি-বউ দুজনেই চিল্লাচিল্লি শুনে, কিন্তু শীতের দিনের পুকুরের মাছের মতো দুজনেই চুপ থাকে।

তখন সূর্য ঠিক মাথার পরে ছিল। খুব করুণ সুরে সবজাহান বেগম ডাক দেয় সানুকে। সেই ডাক পেয়ে ও উঠে আসে। নিজের অবস্থা তো বুঝে, কিন্তু শাশুড়ির অবস্থা অনেক খারাপ। এই বয়সে এতক্ষণ পানিতে থাকা সহজ নয়। একটু গরম পানি দরকার কিন্তু চুলায় তো পানি ঢালা। আস্তে আস্তে দুজনে পুকুর ঘাটে যায়, গোসল সেরে ঘরে এসে ভাত-ডাল খায়।

আসরের নামাজ পড়ে ঘরের সামনে বসে আছে শাশুড়ি আর বৌমা।

- ভুঁইয়ার ঝিঁ, মনে অয় তোয়ারে এই বাইত রাওন ঠিক অইব না। কাইলগাই আঁই তোয়ারে বেয়াইয়ের কাছে দিই আইয়ুম। হেই বাইত তুঁই থাকবা।

- আম্মা আঁই চলি গেলে আন্নে একলা থাকবেন কেন্নে।

- দিনে যা আছি, তাই থাক্কুম, রাইতে রায়েলাকে লই ঘুমাইয়ুম। তাও বালা কিন্তু তোয়ারে লই আঁর চিন্তা কইত্তে হাইত্তাম নো। গেছে শনিবার শয়তানের দল হেই গেরামে ঢুকছে। যেই যেই বাইর বেডারা যুদ্ধে গেছে হেই বাইর বউ-ঝিঁ গোরে তুলি লই গেছে।

পরদিন সকালে সবজাহান বেগম বউমাকে নিয়ে বিয়াই বাড়ি যায়। বিয়াই ছিদ্দিকুর রহমানকে বুঝিয়ে বলেন-

- বিয়াই সাব আপনের মাইয়ারে অনেক সাধ করি নিলাম, নিতে নিতেই যুদ্ধ। হোলাও নাই, একলা বাড়ি, আঁই ভয়ে ভয়ে থাই। রিয়াজ আইলে ওরে এই বাইত আইতে কমু। বউমা ইয়ানো থাকলে আঁর ভয় কম।

সানুকে বাপের বাড়ি দিয়ে সবজাহান বেগম ফিরে আসেন। সারাদিন একা একা থাকে, রাত হলেই বড়ো বাড়ির রাহেলা আসে, ওকে নিয়েই ঘুমায়।

সদ্য স্বামীহারা একজন নারীর চোখে ঘুম থাকার কথা নয়, ঘুমও আসে না। ঘুমাতে গেলেই মনে পড়ে যায় তার ঘর ভরা মানুষের কথা। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, বউ-মাসহ ঘর ছিল জমজমাট। আজ সেই ঘরে সবজাহান একেবারেই একা। কবে যুদ্ধ শেষ হবে, বিজয়ের বেশে রিয়াজ ফিরবে। ছেলেসহ গিয়ে বউমাকে নিয়ে আসবে। ঘর আবার ভরে উঠবে আনন্দে।

রিয়াজের বাবা আলী আকবর সাহেব ছিলেন স্কুলের শিক্ষক, সুখের সংসার তাদের। দুজনে ঠিক করেছেন নতুন বাড়িতে এসে ছেলেকে বিয়ে করাবেন। সেভাবেই নতুন বাড়িতে আসার দুই বছরের মাথায় রিয়াজের সরকারি চাকরি হলো। বিয়ের কথা বলতেই রিয়াজ বাবা-মাকে বলে-

যেই কথা সেই কাজ। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে রিয়াজ ও সানুর বিয়ে হয়। বিয়ের মাত্র তিন মাসের মাথায় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু। যুদ্ধের প্রথম থেকেই রিয়াজ শত শত বাঙালির সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে। ওর বাবা আলী আকবর সাহেব মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ওষুধ, খাবার, কাপড়চোপড় সরবরাহ করতেন। একদিন সেভাবেই কিছু শুকনো খাবার নিয়ে আলী আকবর সাহেব বাড়ি থেকে বের হন, কিন্তু দিন-মাস পার হলেও আর ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে সবাই ধরেই নিয়েছে নিশ্চয়ই আর ফিরবেন না।

বংশীয় ঘরের মেয়ে সানু। সাত বোন তিন ভাই ওরা। বোনদের মাঝে ছয় নম্বর ও। বাবা সিদ্দিকুর রহমানের

খুব আদরের মেয়ে। ছোটো থেকেই সানুর বাবা বলতেন-

তোকে আমি কাছেই বিয়ে দিবো, যেন যখন-তখন যেতে পারি।

সবজাহান বেগমের তাড়নায় মাত্র দুই সপ্তাহের মাঝে ওদের বিয়ে হয়। রিয়াজ বিয়ে উপলক্ষ্যে দুই সপ্তাহ ছুটি পায়। এই দুই সপ্তাহ খুব আনন্দেই কাটে সবার। শহর থেকে পুরো পরিবার নিয়ে আসে ওর বোন বিলকিস। ডিসেম্বর মাস জুড়েই ছিল ওদের আনন্দ আর আনন্দ। এত আনন্দের পর এমন বেদনা সহ্য করার নয়।

শহরের বাড়িতে অনেকটা বন্দি জীবনযাপন করছে বিলকিসের পরিবার। সবজাহান বেগমের দিন কাটে তো রাত কাটে না। ৩/৪ দিন পর পর গিয়ে বউমায়ের সাথে দেখা করে আসে। রিয়াজ যুদ্ধে আছে এটা সবার জানা, এই খবরগুলো আরো বেশি থাকে পাকবাহিনীর সাথে হাত মেলানো দেশীয় রাজাকারদের কাছে। রিয়াজের বউ বাড়ি নেই এটা ওদের কাছে পৌঁছে যায়। ওই দলের দুজনকে ভুঁইয়া বাড়ির আশেপাশে দেখা যায়। সানুর বাবা-মা খুবই চিন্তায় পড়ে মেয়েকে নিয়ে। দিনে যেমনি থাকে রাতের বেলায় ভয় বেড়ে যায়।

অতঃপর সানুকে ওদের পাশের বাড়ির এক চাচার ঘরেই ঘুমাতে দিতো। সন্ধ্যা হয়ে এলে হাতে-মুখে কালি মেখে মেয়েকে পুরানো শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আসত। আবার দিনের বেলায় নিয়ে আসত। এই ভাবেই সানুর কয়েকদিন কেটে যায়।

এলাকার অন্য এক মুক্তিযোদ্ধা গ্রামে আসছে দেখে রিয়াজ তার মা ও সানুকে চিঠি লিখে পাঠায়। আসলে ওই সময়ে চিঠি লেখার সময় তো নেই, তবুও প্রিয় মানুষদের জন্যে দুই কলম।

মা,

আমি জানি তুমি খুব কষ্টে আছো। ভাবছ বাবা আর ফিরবে না, আমার মন বলছে বাবা ঠিক ফিরবে। বিজয়ের বেশে আমরা ঠিক ফিরব। দোয়া করিও, আমি ও আমরা ভালো আছি।

ইতি

তোমার বাবু।

সবজাহান বেগম রিয়াজকে বাবু বলেই ডাকেন। সানুকে লেখে-

প্রিয় সানু,

আজ অনেকদিন তোমাদের সবাইকে ছেড়ে আছি। আমাদের শরীরে একফোঁটা রক্ত থাকতেও আমরা পেছন ফিরে আসব না। প্রতিটা মুহূর্ত এখন লড়াইয়ের। জয় আমাদের হবেই। মা খুব কষ্টে আছে, মায়ের সাথে গল্প করবে, সময় দিবে। বিজয়ের দিন আমি ফিরব স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে। ভালো থেকো তুমি।

ইতি

রিয়াজ।

চিঠি নিয়ে সবজাহান বেগম বিয়াই বাড়ি যায়, বউমাকে দেখে আসে আর চিঠিও দিয়ে আসে। সময় কাটে না সবজাহান বেগমের। নিজের ঘরেই তার সারা সময় থাকতে হয়, এদিক-ওদিক যাবে সেই পথ নেই। যেদিকেই যায় সবাই বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করে, আলী আকবরের কথা জিজ্ঞেস করে। যদিও স্বামীকে অনেক খুঁজেছে তবুও মনের মাঝে স্বপ্ন উঁকি দেয়, কানে কানে কেউ যেন এসে বলছে-

'সে ফিরবে, সে ফিরবে।'

আধো ঘুমে চমকে উঠে স্বামী সন্তানের ডাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর যে ঘুম আসে তার চোখে তা যখন এলোমেলো স্বপ্নে ভেঙে যায়, উঠে নামাজের বিছানায় বসে। উপরওয়ালার কাছে হাত তুলে আপনজনদের জন্যে ফরিয়াদ করে। সুস্থভাবে ফিরে আসার জন্যে প্রার্থণা করে।

নিখোঁজ হয়েছে স্বামী-সন্তান গেছে দেশের কাজে। ঘরের লক্ষ্মীকেও দিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। কিন্তু সবজাহানের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আছে শুধু সংসারকে আগলে রেখে অপেক্ষা করা। ভাবে এই বুঝি ফজরের আজানের সময় আলী আকবর তাকে ডাকছে নামাজ পড়তে। এই বুঝি ডেকে বলবে-

- উঠো না বাবুর মা, নামাজটা পড়ে আঁরে ইক্কিনি রং চা করি দেও। লগে দুই মুঠ মুড়িও দিও।

দুপুরের পর যখন একটু ঝিমুতে থাকে তখন ভাবে এই বুঝি স্কুল থেকে ফিরল সে। ছাতা আর স্কুলের থলেটা হাতে দিয়ে বলছে-

- বাবুর মা, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো। আঁই হুইরের তুন ওজ্ঞা ডুব দিই আই।

ভাবনা চলতে থাকে কিন্তু কেউ আসে না। বাড়ি আসতে বাবুকে চিঠিও দিতে পারে না। দুইদিনের ছুটি পেলেই রিয়াজ বাড়ি আসতো, আর আজ কয় মাস হলো ছেলেকে দেখে না। তবে অন্যদের কাছে খোঁজখবর পায় বলে একটু সান্ত্বনা মনে।

চিন্তা করতে করতে যখন অস্থির হয়ে যায়, নিজেই চিল্লাতে থাকে। স্বামীকে আর ছেলেকে বকা দিতে থাকে-

- তুঁই তো চইলা গিয়ে বালা কইচ্ছ, আঁরে ঘরের হালার মতো থুইয়া গেছো। গেলাই যন আঁরে লইয়াই যাইতা।

- বাবু আঁই আর হাইত্তাননো এই সংসার হরা দিতে। তুই আয় বউরে আইনা সংসার কর।

চিল্লাতে চিল্লাতে নিজেই কাহিল হয়, কেউ শুনেও না, জবাবও দেয় না। একেবারে অস্থির হয়ে গেলে বড়ো বাড়ি যায়, রেডিওতে খবর শুনে আসে। এই তো দু দিন আগে বলল বাঙালিরা নাকি অনেক জায়গায় দখল করে ফেলেছে। অনেক জায়গায় নাকি দেশের পতাকাও উড়তে দেখা গেছে।

বড়ো বাড়ির ছোটো মিয়া শহর থেকে এসেছে, সবার সাথে কথা বলে, শহরের কথা বলে। সবাইকে সাহস দেয়। বলে-

- ভারত আমাদের সাথে আগেও ছিল এখনও আছে। ভারতের সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন পাকিস্তান যদি পূর্ব বাংলায় তাদের পরাজয় স্বীকার করে নেয় তবে সকল অঞ্চলেই এই যুদ্ধ বন্ধ হবে। এর আগে বন্ধ হইব না।

আশেপাশে হইচই পড়তে শুরু করে। পাকবাহিনী নাকি সব জায়গায় হেরে যাচ্ছে। তারা পেছন ফিরে যাচ্ছে। পাকবাহিনী যখন বুঝতে পারে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, ঠিক সেই সময় নারকীয় হত্যাযজ্ঞে নামে এবং ২৫শে

মার্চের মতো হত্যাকাণ্ড ঘটায়। ১৪ই ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে মেধাশূন্য করে অনেক জায়গায়। ১৪ই ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে এক জঘন্য বর্বর ঘটনা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষকে স্তম্ভিত করেছিল। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পৈশাচিকভাবে হত্যার পর ঢাকার মিরপুর, রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে লাশ ফেলে রেখে যায় । বুদ্ধিজীবীদের লাশ জুড়ে ছিল আঘাতের চিহ্ন, চোখ-হাত-পা ছিল বাঁধা, কারো কারো শরীরে একাধিক গুলি, অনেককে হত্যা করা হয়েছিল অনেক কষ্ট দিয়ে।

যৌথবাহিনী ঢাকার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। বাধ্য হয়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হলো বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নসাধ–বিজয়।

১৯শে ডিসেম্বর ভোরে রিয়াজ বাড়ির পথে রওয়ানা দেয়। পথে জানতে পারে পাকসেনারা একটা গোপন আস্তানায় অনেক নিরীহ বাঙালিকে আঁটকে রেখেছে। রিয়াজসহ কয়েকজন সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। একই ঘরে নারী-পুরুষকে হাত-চোখ বেঁধে রেখেছে ওরা। প্রায় দুই মাস ওরা এখানে। সবাইকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। দায়িত্ব শেষ করে ফেরার সময় পেছন থেকে কেউ একজন রিয়াজের কাঁধে হাত রাখে। ও পেছন ফিরতেই তিনি বলে উঠেন-

- বাবু তুই আমাকে চিনতে পারিসনি।

রিয়াজ কণ্ঠ শুনে বুঝে যায় ইনি তো ওর বাবা আলী আকবর। সাথে সাথে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে। স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে দুজনেই বীরের মতো গ্রামে আসে। চারপাশে আনন্দের জোয়ার বইছে। সবজাহান বেগম একই সাথে স্বামী ও সন্তানকে ফিরে পেলেন। সবাই মিলে বিয়াই বাড়িতে যায়, সানুকে নিয়ে আসে। স্বাধীন দেশেই শুরু হয় ওদের নতুন জীবন। ❑

লেখক- সাহিত্যিক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক

আরিশা হাসান, কেজি শ্রেণি, কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

গল্প

ফায়ান ও ময়না পাখি

মুহিব্বুল্লাহ কাফি

ডানপিটে ফায়ান। দুরন্ত ও চঞ্চল। এতটুকু বয়সে উপস্থিতবুদ্ধিও তার বেশ। যথাসময় জুতসই বুদ্ধি তার মাথায় ঠিকই খেলে যায়। বয়স আর কত হবে? এই তো ক্লাস সিক্সের ছাত্র ও। ক্লাসের ফার্স্টবয়। নিয়মিতভাবে ক্লাস করে ফায়ান। সবার সাথেই ভালো ব্যবহার তার। মিশুক। অমায়িক ফায়ান। সমীহ করে সবাইকে। কিন্তু পড়ালেখায় কাউকে তোয়াক্কা করে না ও। প্রতি পরীক্ষায় রোল এক নাম্বার তার জন্য বরাদ্দ। ফায়ান পড়ালেখায় খুব আগ্রহী। মনোযোগী।

তবে পড়ালেখা ছাড়াও তার আরেকটা বাতিক রয়েছে। তা হলো, গুলতি নিয়ে ছুটাছুটি, পাখির পিছু পিছু। তাদের বাড়ির পাশে রকমারি গাছগাছড়া দিয়ে ছোট্ট জঙ্গল গড়ে উঠেছে। ময়না, টিয়া, ঘুঘু, শালিকসহ অনেক প্রজাতির পাখি উড়াউড়ি করে সেখানে। ওখানেই ফায়ানের অভিযান চলে।

গুলতি মার্বেল নিয়ে শিকার খোঁজে। যদিও তাদের স্কুলের পেছনেও ওরকম একটা জঙ্গল আছে। আছে পাখপাখালিও। তবে ওখানে ঢের মৌচাক। মৌমাছির ভয়ে ফায়ান স্কুলের পেছনের জঙ্গলে খুব একটা যায় না। মৌমাছিদের একটা ভালো গুণ আছে। তারা যেখানে যাবে, যাবে একসাথে। যাকে আক্রমণ করবে, দলবদ্ধ হয়ে করবে। যেন শত্রুপক্ষ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। তাই তাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলেই থাকে ফায়ানের দৌড়ঝাঁপ। ওখানে মৌচাকের ঢিবি তেমন নজরে পড়েনি।

ফায়ান পড়ালেখায় ফাঁকিবাজ নয়। মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন গুলতি নিয়ে ছুটাছুটি করলেও, পাখির পিছু পিছু ছুটলেও সন্ধ্যেবেলা ঠিকই হাজির ঘরে। বাদ মাগরিব পড়ার টেবিলে ফায়ান। বইখাতা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। যেন পড়ালেখা সবার আগে। তাই মা-বাবাও তেমন কিছু বলেন না। ছেলে পড়ালেখা তো ঠিকমতো করছে। এই বয়সে একটু ছুটাছুটি তো করবেই। নাহয় মস্তিষ্ক বিকাশিত হবে কীভাবে?

স্কুল ছুটি হলেই ব্যস। এক ছুট সেই ছোট্ট জঙ্গলে গুলতি নিয়ে। এ গাছ থেকে ও গাছে ছুটে বেড়ায় দুরন্ত ফায়ান। গুলতি দিয়ে ছুড়ে মার্বেল। পাখির গা বরাবর। লক্ষ্যচ্যুত হবার কোনো জো নেই। পাক্কা নিশানা ফায়ানের।

অমনি ডিগবাজি খেয়ে আহত হয়ে চিঁ চিঁ করতে করতে লুটিয়ে পড়ে টার্গেটের পাখি। খুব বেশি জখম হলে সেগুলো জবাই করে খেয়ে নেয় ফায়ান। ভারি মজা হালাল পাখির মাংস।

কিন্তু শিকার করা যে পাখিগুলো অল্প জখমি হয় সেগুলোকে ফায়ান সুস্থ করে তোলে সেবা ও আদরযত্নে।

দেখভালের কোনো কমতি রাখে না। এরপর ধীরে ধীরে পোষ মানায়। কথা শেখায়। এর আগে একটা ঘুঘু পোষ মানিয়েছিল ও। কিন্তু ঘুঘুটা চুরি হয়ে গেছে। স্কুল যাওয়ার সময় ফায়ান ঘুঘুকে তার খাঁচায় বন্দি করে রেখে যায়। স্কুল শেষে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই পাড়া থেকে ওই পাড়া। কিন্তু একদিন স্কুল থেকে এসে দেখে খাঁচায় নেই তার ঘুঘু। এদিক-সেদিক গিয়ে ডাকাডাকি করল ফায়ান। কিন্তু ঘুঘু ফিরে এল না আর। শেষে ফায়ান আবিষ্কার করল চুরি হয়েছে তার পোষমানা ঘুঘু।

এরপর ফায়ান শিকার করল একটা ময়না পাখি। পোষ মানাতে লাগল ময়নাকে। কিন্তু কিছুতেই ময়না পোষ মানছিল না। ঘুঘুকে অবশ্য পোষ মানাতে এত সময় লাগেনি। শেষে খুব কষ্ট করে ময়নাকে পোষ মানাতে পারল ফায়ান। এমনকি কথাও শিখিয়ে দিলো ময়নাকে। তার জন্য প্রায় বছর লেগেছিল তার। খুব কষ্ট হয়েছিল ওর। এরপর ফায়ান যেখানেই যায় সাথে থাকে ময়না। এমনকি স্কুলেও ফায়ানের সাথে যায় ময়না। ফায়ান ক্লাস করে। ময়না ছুটাছুটি করে এদিক-সেদিক। ক্লাস শেষে একসাথে বাড়ি ফেরে ওরা। ময়না কখনো ডানা ঝাঁপটিয়ে ঝাঁপটিয়ে চলে ফায়ানের আগে আগে। কখনো আবার ফায়ানের কাঁধে বসে। গপ্প করতে করতে। ফায়ান ঘুঘুর মতো ময়নাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখে না। যেখানেই যায় সাথে নিয়ে যায়। কথা বলে ময়নার সাথে। ময়নাও কথা বলে ভাঙা ভাঙা শব্দে। ধীরে ধীরে। তবে ময়নার কথা বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। ফায়ান ঠিকই সব বুঝে নেয়। তাদের মধ্যে এমন এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠে যা খুব কম মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এমনকি কথা না বলেও চোখের ইশারায় একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারে। ফায়ান ও ময়নার সখ্যতা দেখে অন্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

এরপর থেকে ফায়ান পাখি শিকার করা ছেড়ে দিলো। পাখিদের দিকে গুলতি নিয়ে আর মার্বেল ছোড়ে না ও। তা যে ঘোরতর অপরাধ। তাদেরও জীবন আছে। আছে তাদের মুক্ত বাতাসে উড়াউড়ির স্বাধীনতা। ফায়ান কেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করবে? ফায়ানের বুঝ আসলো। অনুতপ্ত হলো।

দুই

সপ্তাহ খানিক হলো স্কুলে যায় না ফায়ান। বলা চলে, যেতে পারে না। বন্ধ স্কুল। দেশে নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকবাহিনী নাকি ঢুকেছে দেশে। তারা বাঙালিদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করছে। আগেই জানত ফায়ান এসব খবর। কিন্তু সেই পাকবাহিনী ঢুকে গেছে তাদের আদরপুর গ্রামেও। এমনকি ফায়ানদের স্কুলেই পাকবাহিনী বেঁধেছে ঘাঁটি। এ খবর শুনে ফায়ানের একরাশ দুঃখ ও রাগ জমে গেল। পাকবাহিনীদের কারণে স্কুলে যেতে পারছে না যে ও। ফায়ান সারাদিন ময়নার সাথে সলাপরামর্শ করে। কীভাবে তাদের গ্রাম পাকবাহিনী মুক্ত করা যায়। কীভাবে তাদের স্কুল উদ্ধার করা যায়।

ফায়ান প্রতিদিন তার ময়নাকে পাঠায় স্কুলে। দেখে আসতে পাকবাহিনীদের অবস্থা। ময়না স্কুলের চারপাশ ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে। এটা ওটা দেখে এসে খবর দেয় ফায়ানকে। তারা কখন খায়। ঘুমায় কখন। কখন তারা গ্রামে বের হয়। এক এক করে ফায়ান পাকবাহিনীদের নিত্যদিনের রুটিন আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু কীভাবে কী করবে। কী করলে এই গ্রাম, এই স্কুল তাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবে। ফায়ান কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন ফায়ানের কানে সংবাদ এল তাদের বাংলা স্যার রঞ্জিত ঘোষের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। হেডমাস্টার আবুল ফজলের মেয়ে জামিলাকে উঠিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে পাকবাহিনী। এভাবে মাত্রাহীন নির্যাতন করছে এ বাড়ি ও বাড়িতে। প্রতিবাদ করতে গেলেই লাইনে দাঁড় করিয়ে পাখির মতো গুলি করে মারছে। ফায়ান আর কিছুই ভাবতে পারছে না। নাহ, ওদের একটা বিহিত করতেই হবে।

শেষে একটা বুদ্ধি এসে গেল ফায়ানের মাথায়। ফায়ান অভিযানে নামবে পাকবাহিনীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার হাতিয়ার?

স্কুলের পেছনের জঙ্গলে যেহেতু মৌচাক আছে সেটাই ফায়ানের এখন একমাত্র হাতিয়ার। সহযোগী?

তার পোষমানা পাখি ময়না। হ্যাঁ, ময়নাই তাকে সাহায্য করতে পারবে। কীভাবে কী করতে হবে ফায়ান সব বুঝিয়ে দিলো ময়নাকে। খুব ভালো করে, বারংবার বুঝিয়ে দিলো ময়নাকে। হ্যাঁ, ময়নাও আয়ত্ত করে নিয়েছে কখন কী করতে হবে। আগামীকালই তাদের অভিযান মিলিটারিদের বিরুদ্ধে।

ভোর হলো। প্রস্তুতি নিলো ফায়ান। সে জানে, তারা সকালের নাশতা সেরে নয়টার দিকে গ্রামে বের হবে। তাই ফায়ান আটটায় পৌঁছে যায় স্কুলের পেছনের

জঙ্গলটায়। হাতে গুলতি ও কিছু মার্বেল। স্কুল ঘেঁষে থাকা একটি গাছে রয়েছে মৌচাক। জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিমে আরেকটি মৌচাক। এটা বেশ বড়ো। তবে, বড়ো মৌচাকটা স্কুল থেকে খানিকটা দূরে। তাই ফায়ান পরিকল্পনা আঁটলো, প্রথমে স্কুল ঘেঁষা মৌচাকে মার্বেল ছুড়বে। পরে বড়ো ওই মৌচাকে ছুড়বে মার্বেল। কারণ, প্রথম মৌচাকের মৌমাছি যেদিকে যাবে পরের মৌচাকের মৌমাছিও ছুটবে সেদিকে। ফায়ান এবার গাছের আড়ালে গুলতি মার্বেলসহ পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিক দিয়ে ফায়ানের কথামতো ময়না ঢুকল স্কুলে। এবং স্কুলের ভেতর ছুটাছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। তারা সবে খেয়েদেয়ে উঠেছে। ময়না গিয়ে একজনের মাথায় ঠোকর দিচ্ছে। আরেকজনের সামনে গিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে যেন পাকবাহিনী বুঝতে পারে ময়নার পায়ে সমস্যা। উড়তে পারছে না। পাকবাহিনী থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই এসব কাণ্ড করছে ময়না। যেন চাইলেই পাকবাহিনী ময়নাকে ধরতে না পারে। ময়নার এমন কাণ্ডকারখানা দেখে হাসাহাসি করে একে অপরের ওপর লুটোপুটি খেয়ে পড়ছিল ওরা। যেই ধরতে যায় ওমনি ময়না ফুড়ুৎ করে উড়ে সামনে গিয়ে বসে। তারা কিছুতেই ধরতে পারছে না ময়নাকে।

এবার ময়নাকে মাঝখানে রেখে দু'পাশ থেকে দুজন পাকবাহিনী দৌড়ে আসলো ধরতে। ওমনি দুজনের হাতের ফাঁক গলে উড়াল দিলো ময়না। তারা দুজন একে ওপরের মাথায় টপাস করে টক্কর খেলো। কিছুক্ষণ দুই পাকবাহিনী জায়গায় বসে রইল। যেন মাথা ঘুরে চড়কগাছ। ময়না এবার বলে বসল,

আপলোক বোকা হে, বোকা।

ময়নার মুখে বোকা শব্দ শুনে পাকবাহিনী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

এ ময়না বাংলা বলতিহে! হামলোক কো বোকাভি বোলতিহে।

পাকবাহিনী উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এরপর রাগে একজন চেঁচিয়ে উঠল, উসকো মাত ছোড়না। উসকো মাত ছোড়না। এ ময়না বেঙ্গলি হে। উসকো মাত ছোড়না বলে বন্দুক হাতে নিলো দুজন। গুলি করবে বুঝতে পেরে এবার ময়না এলোপাথাড়ি উড়তে লাগল। আঁকাবাঁকা উড়ে উড়ে ময়না চলে আসলো স্কুলের পেছন ঘেঁষে থাকা ঠিক মৌচাকের নিকট। দুজন পাকবাহিনী বন্দুক হাতে ছুটে এল ময়নার পিছু পিছু। এবার ময়না মৌচাকের সোজাসুজি শূন্যে উড়ে ডানা ঝাঁপটাতে লাগল। আর বলতে লাগল, আপলোক বোক হে, বোকা।

এক পাকবাহিনী সাতপাঁচ না ভেবে ছুড়ল গুলি ময়নার বরাবর। অমনি পাশ কেটে গেল ময়না। গুলি পড়ল গিয়ে মৌচাকে। সর্বনাশ! মুহূর্তের মধ্যে মৌমাছি দল আক্রমণ করল তাদের ওপর। লুকিয়ে থাকা ফায়ান এ কাণ্ড দেখে একগাল হেসে নিলো। যে কাজ ফায়ান করার জন্য লুকিয়ে রইল সে কাজ তারাই সেরে নিলো। কিন্তু এমনটা ছিল না ওদের প্ল্যান। ফায়ানের সাথে থেকে বেশ ভালো বুদ্ধি হয়েছে তো ময়নার।

যাক, এবার ফায়ান কালবিলম্ব না করে গুলতি দিয়ে ছুড়ল মার্বেল একটু দূরে থাকা উত্তর-পশ্চিমের ওই বড়ো মৌচাকে। মুহূর্তের মধ্যে বড়ো মৌচাকের মৌমাছিরাও ভোঁ ভোঁ করে পিছু নিলো ওই মৌমাছিদের। একত্র হয়ে আক্রমণ করল তাদের ওপর। দুই পাকবাহিনী মৌমাছির কামড় খেয়ে দিলো দৌড়। যাকে বলে ভোঁ-দৌড়। স্কুলের ভেতর। এবার মৌমাছিরা ঘেরাও করে নিলো পুরো স্কুল। এদিক-সেদিক যেদিকেই দৌড়ায় তারা মৌমাছি আর মৌমাছি। মৌমাছি তাদের সবাইকে হুল বসিয়ে দিতে লাগল। মৌমাছির হুলের কারণে কারোর নাক লাল টমেটোর মতন হয়ে ফুলে উঠল। কারোর চোখ ফুলে বেগুনির মতো হয়ে উঠল। লাল মরিচের মতো ফুলে উঠল কারোর আঙুল। সবার নাজেহাল অবস্থা। মৌমাছির এমন আক্রমণের মুখে পড়ে পাকবাহিনী বলে বসল, এ বিচ্ছুবাহিনী কাঁহাছে আয়া। এ বিচ্ছুবাহিনি ভি বেঙ্গুলি হ্যায়। এ বিচ্ছুবাহিনী হাম সাবকো মারদেগে, ভাগো। এই বলে পাকবাহিনী দিলো ছুট। গেল পালিয়ে আদরপুর গ্রাম ও স্কুল ছেড়ে। ❑

গল্পকার

কবিতাগুচ্ছ

বিজয়

শ.ম. শহীদ

উঠল তপন!
ফুটল আলো!
ঘুচল তিমির-
আঁধার কালো!
কাটল সকল ভয়!

লক্ষ বীরের-
রক্তে নেয়ে,
শেখ মুজিবের-
নৌকা বেয়ে,
এল মোদের জয়!

দেখল চেয়ে-
বিশ্ববাসী,
কামার, কুমার,
জেলে, চাষি
আকুতো নির্ভয়!

অসীম সাহস-
নিয়ে বুকে,
পাক সেনাদের-
দিলো রুখে,
আনলো কেড়ে জয়।

স্বাধীনতার বাণী

আনোয়ারুল হক নূরী

পথ মাড়াতে দূর্বাদলে
জড়িয়ে রাখে পার্টি ।
শিশির কেঁদে কামড়ে ধরে
গন্ধভরা মাটি ।
জবা বলে মাড়াস নে ভাই
আমার কোমল বুক ।
বোনের খোঁপা পেলেই বুঝি
তোমার ফোটার সুখ ?
জবা বলে, খোঁপা ঝরার
একাত্তরের স্মৃতি।
রক্ত ছুঁয়ে রাঙিয়ে গা
দিয়েছিলাম প্রীতি ।
জলভরা বুক নদীর পাশে
ঝাউয়ের ব্যাকুল কাঁপা ।
পিনপিনে এক শাড়ি বোনা
মায়ের গায়ের মাপা ।
হয়ত মায়ের এই শাড়িটা
একাত্তরে রাখা ।
রক্তের দাগ শুকিয়ে এখন
কাঁদছে গাছের শাখা ।
বোনের খোঁপা মায়ের শাড়ি
দিচ্ছে যে হাতছানি ।
টুকটুকে লাল জবার বুকে
স্বাধীনতার বাণী ।

এ বিজয় স্বাধীনতা

খোরশেদ আলম নয়ন

আমাদের আছে পদ্মা, মেঘনা
সুরমা ও মধুমতি
তারই ধারা হতে পাই যে আমরা
এগিয়ে চলার গতি।

আমাদের আছে শাপলার হাসি
আছে দোয়েলের গান
সেই হাসি আর সেই গানে পাই
সুর খুঁজে অফুরান।

আমাদের আছে দিগন্ত ছোঁয়া
সবুজের হাতছানি
সেই দিগন্তে দু'হাত বাড়িয়ে
স্বপ্নকে কাছে টানি।

আমাদের আছে সূর্যসেন আর
ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা
যাঁদের প্রাণের পরশে পেয়েছি
এ বিজয় স্বাধীনতা!

বীর বাঙালি

মিয়াজান কবীর

সবুজ-শ্যামলে ঘেরা বাংলা,
লাউ-কুমড়ো-ঝিঙে ভরা জাংলা।
মধুবসন্তে ছড়ায় ফুলের ঘ্রাণ
গ্রীষ্মে কালবৈশাখির রুদ্র প্রাণ।

বাংলা মায়ের বীর বাঙালি
রক্তে জ্বালে দীপ-দীপালি।
একতারাতে গায় বাউল সুরে গান,
দস্যু তাড়াতে ছুঁড়ে অগ্নিবাণ।

বিজয় ফিরে এল

গোলাম নবী পান্না

দেশটা স্বাধীন হলো এবং
বিজয় ফিরে এল
জাতি নতুন মানচিত্র
গর্ব করে পেলো।

সেদিন জাতি লড়েছিল
স্বাধীনতা চেয়ে
খুশির জোয়ার বইছে আজ
বিজয়টাকে পেয়ে।

আত্মত্যাগের বিনিময়ে
মহান বিজয় আঁকা
এই বিজয়ের পতাকাটা
আঁকড়ে ধরে থাকা।

গল্প

শালবনের সূর্যশিখা

মোস্তাফিজুল হক

শাল, মহুয়া, গামার, তেলসুর, বট, অশ্বত্থসহ আরো নাম না জানা কত শত পাহাড়ি গাছ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আঁকা ছায়াঢাকা গাঁও হালচাটি। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথের গ্রাম। সেই গাঁয়ের এক হাসিমাখা মুখের সরল কিশোর সালাম। সরল হলেও সে তার গাঁয়ের গারো পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। কারণ, তার এই গ্রামটাও যে পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলে। পাহাড়ের নির্জনতায় প্রায়ই বুনো শুয়োরের মুখোমুখি হতে হয় সালামদের। টিলার সমতলে ছনের ছাউনি আর মুলিবাঁশের বেড়ায় ঘেরা গুটিকয় বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে সালামের গ্রাম।

হাজার পাখির কলতানে ভোর হয় হালচাটি গাঁয়ে। লালমাটির উঁচু পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝরনার ধারা ছন্দের তালে তালে নেচে নেচে বয়ে চলে। যতদূর চোখ যায়, সবুজ আর সবুজ। ওপারের মেঘালয় চূড়ার সাথে এপারের মেঘের মিতালি। গহীন অরণ্য ভেদ করে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে টকটকে লাল সূর্য এসে গাঁয়ের মানুষকে ভোরের অভিবাদন জানায়। জানাবেই তো, এই গ্রামেই যে ঘুমিয়ে আছে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা সালাম!

সেই বিভীষিকাময় একাত্তরে সালাম চৌদ্দ বছরের দুরন্ত

কিশোর। ওর দুই চোখে শাণিত বুদ্ধির ঝলমলে ঝিলিক। ওর বাবা সেই শৈশব থেকেই ওকে বঙ্গবন্ধু আর দেশের মানুষের গল্প শোনায়। সৈনিক বাবা সালামকে প্রায়ই বলেন, 'বাবা, আমরা একদিন স্বাধীন দেশের নাগরিক হব। আর তা হবে একান্তই আমাদের নিজেদের দেশ; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা, বাংলাদেশ। সেই স্বাধীন দেশের বুকে তুই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবি। সেদিনটা মনে হয় খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এই দেশে বিজাতীয়দের শোষণ আর অত্যাচার থাকবে না।'

সালাম বেতারে খবর শোনে। দেশের আর দেশের মানুষের খবর। ৭ই মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ। ক্লাস এইটে উঠেছে সালাম। পড়াশোনায় তার অঢেল মনোযোগ। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বিবিসি-র খবর শুনতে বসে যায়। সেদিন বিবিসি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করছিল। সালাম বেতারে সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতা স্পষ্ট শুনতে পেল। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।... আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।... সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।... প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

সালামের মনটা কেমন কেমন করে। ওর বাবার কথা মনে পড়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে এই ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মূলমন্ত্র। সে ভীষন আবেগি হয়ে পড়ে আর স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ওর কিশোর মনে মানবতার এক তীব্র উচ্ছ্বাস ধুকপুক করে। ওর ধমনী আর শিরায় শিরায় চিরন্তন সাহসী তেজোদ্দীপ্ত গৌরবময় বাঙালির অণুচক্রিকা যেন উন্মাতাল হয়ে পড়েছে।

২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। রাতের গভীরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গ্রেফতার হলেন। ফলে দেশব্যাপী শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। গোপনে গোপনে দেশপ্রেমিকরা যুদ্ধে অংশ নিতে সংগঠিত হতে থাকলেন। সালাম কেন পিছিয়ে থাকবে? তাই সে-ও মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট সেন্টারে ছুটে গেল। কিন্তু ও তো একদম ছোটো! তাই সালামকে কেউ-ই নিতে চাইল না। সে ভীষণ মর্মাহত হলো।

সালাম বিষণ্ন মনে পাহাড়ি টিলার ভাঁজে বসে থাকে। বাবা যথারীতি মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছেন। তিনমাস হলো ওর বাবা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন। হঠাৎ গ্রামের রাজাকার বাহিনী এ খবর জেনে ওদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলো। ওর মাকেও মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেল! ভাগ্যিস সালাম সে সময় বাড়িতে ছিল না। সে বাড়ি ফিরে পোড়াবাড়ি দেখে আর সব ঘটনা জেনে সোজাসুজি অনার্সের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলমের কাছে ছুটে গেল। এবার তাকে যে করেই হোক মুক্তিযোদ্ধা হতেই হবে। শামসুল কিশোর সালামকে ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি তাকে গোপনে গোপনে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন।

যৌথবাহিনী গঠিত হলে সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সামরিক অবস্থান শক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বিশেষ করে সীমান্ত ফাঁড়িগুলো দখলে নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে নকশী বিওপি খুবই ভয়ানক। এই সীমান্ত ফাঁড়ি যে হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী দুর্গ। চারদিকে পুরু মাটির দেয়াল। দেয়ালের ভেতরে বড়ো বাংকার। কামান ও মর্টারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী পরিখা। বিওপি'র চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। যৌথবাহিনী এই বিওপিকে দখলে নিতে আগ্রহী।

নকশী বিওপি আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হলো ক্যাপটেন আমিন ও লেফটেন্যান্ট মোদাচ্ছেরের নেতৃত্বে দুই

কোম্পানি মুক্তিফৌজকে। কাট অফ পার্টি হিসেবে সুবেদার হাকিমের ইপিআর কোম্পানিকে নিযুক্ত করা হলো।

সেদিন ছিল ৩রা আগস্ট, তখন ভোর পৌনে চারটা। কোম্পানি কমান্ডারদের নেতৃত্বে দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা দ্রুততার সাথে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব থাকলেও অসামান্য দৃঢ়তায় ঘাঁটির পঞ্চাশ গজের মধ্যে ঢুকে গেল মুক্তিফৌজ। তাঁদের গ্রেনেড নিক্ষেপে ক্যাম্পের নিরাপদ আস্তানা থেকে হানাদাররা টিলার দিকে সরে গিয়ে প্রচণ্ড মর্টার শেল নিক্ষেপ করতে থাকল। হানাদাররা মুক্তিবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। সেখানে ওরা প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাইনের মজুদ রেখেছিল। তাই অল্প সময় পরেই ওরা মুক্তিবাহিনীর উপর পালটা হামলা চালায়।

এদিকে মুক্তিবাহিনী শত্রু শিবিরের একশ গজ ভেতরে পৌঁছে গেছে। তাঁদের উপর শত্রুসেনার একটি আর্টিলারি শেল বিস্ফোরিত হলো। এতে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হলেন। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা অনেকটা ছত্রভঙ্গ হলেন।

এদিকে অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদের পায়ে শেলের টুকরা এসে লাগল। তবে আঘাতের গুরুত্ব বুঝে উঠার আগেই তিনি শত্রু শিবিরের আরও পঞ্চাশ গজ ভেতরে ঢুকে গেলেন। ছত্রভঙ্গ হলেও পলায়নরত শত্রুসনাকে লক্ষ্য করে মুক্তিযোদ্ধারা গুলি ছুঁড়তে থাকলেন। এতে শত্রুপক্ষেও হতাহতের ঘটনা ঘটল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এ সময় অনার্সের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম মাইনের আঘাতে শহিদ হলেন! তাই এবার ক্যাপ্টেন আমিন আরও তেজোদ্দীপ্ত হয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠিক তখনই তাঁর বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চিবিদ্ধ হলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। শত্রুসেনাও খুব কাছাকাছি। এক পাকিস্তানি সেনা তাকে বেয়নেট বিদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। গুরুতর আহত হয়েও তিনি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হতে সাইড রোল চালালেন।

মুক্তিযোদ্ধারা অনেকটাই হতাশাগ্রস্ত। এরকম পরিস্থিতিতে এক অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটল! সময়টা তখন দিনের সূর্য উঁকি দেবার। ঠিক এমনই এক শুভক্ষণে কিশোরযোদ্ধা সালাম পঞ্চাশ গজ হেঁটে উলটো শত্রু শিবিরের দিকে ফিরে এলেন। বলে রাখা ভালো, শহিদ শামসুল আলমের অনুরোধে সালাম স্থানীয়ভাবেই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। পরিবারের আর কেউ বেঁচে না থাকায় তাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে রাখা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ সেই সাহসী কিশোরযোদ্ধা সালাম দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটি এলএমজি নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে শত্রুর দিকে ছুটে গেলেন। এদিকে শত্রুপক্ষও অগ্রসর হয়ে আক্রমণের জন্য মাটির দেয়ালের পেছনে সংগঠিত হচ্ছিল।

'ওরে! তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি কি তোদেরকে ছেড়ে দেবো'– চিৎকার করতে করতে সালাম সেই শত্রু-বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে গেল। শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন সৈন্য পুনরায় প্রস্তুতি নেবার আগেই ব্রাশফায়ারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুরো যুদ্ধের ময়দান তখন লাশে ভরে গেল। দুই পক্ষেই বৃষ্টির মতো গুলি চলতে থাকল। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের কভার দিতে ফায়ার বেইসে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর মেশিনগান ঘন ঘন গর্জে উঠতে লাগল। অপারেশন শেষ করে সে রাতে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এল। কিন্তু অকুতোভয় বীর কিশোর সালাম হানাদার বাহিনীর গুলিতে হালচাটি গাঁয়ের শালবনে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিলেন। তিনি মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে শহিদ হলেন। এই অদম্য বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রাণত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। সেদিনের ভোরের সূর্য অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয়ে মোড়া মুক্তির বার্তা নিয়ে এল। ফলে শালবনের সবুজ আর সালামের বুকের লাল রক্তে আমরা পেলাম একটি পতাকা, পেলাম বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ। ❑

শিক্ষক, ছড়াকার ও গল্পকার

মুজতানিবা মোজাহিদ, পঞ্চম শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

শিমুলের বিজয় দিবস

মমতাজ আহাম্মদ

পলাশের বয়স দশ আর শিমুলের বয়স বারো। ওরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক কিছু জানে। ওদের খুব কৌতূহল। তাই ওরা ওদের বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে গেছে কেন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে, কেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের হত্যা করছে, কার নির্দেশে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে মরণপণ যুদ্ধে।

'আমার বয়স যদি ছোটো চাচার মতো হতো তাহলে আমিও তার সাথে যুদ্ধে যেতাম।' বলল পলাশ।

'আমিও। আমি খুব ভালো গুলতি চালাতে পারি।

পলাশ আর শিমুল আবার ছুটছে ছাদের দিকে। কারণ কয়েকটা ফাইটার বিমান এদিকেই আসছে। ওরা সেগুলোই দেখার চেষ্টা করে ছাদে গিয়ে। তাদের পিছু পিছু ছুটছে তাদের বড়ো বোন লামিয়া। কিন্তু সে কি আর তাদের সাথে পেরে উঠে? এক ছুটে দুই ভাই ছাদে পৌঁছে গেছে। ওদের ছাদের উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়ে গেল কয়েকটা ভারতীয় জঙ্গি বিমান। সেই শব্দে কানে তালা লেগে গেল লামিয়ার। সে দুই হাত কানে ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তারা তাদের পুরনো ঢাকার বাসায়ই ছিল। শুধু এক মাসের জন্য গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল। তারপর একদিন কার্ফু শিথিল হতেই আবার ফিরে এসেছিল বাসায়।

লামিয়ার দুই চাচা যুদ্ধে গেছে। ছোটো চাচা মিরাজ আর মেজো চাচা রিয়াজ। গত ছয় মাস হলো তাদের কোনো খবর নেই। লামিয়ার বাবা সবার বড়ো।

'এই চল নিচে চল।' ভাইদের তাড়া দিল লামিয়া।

'না, আমরা যাব না।' বলল শিমুল।

'আমরা বিমান দেখব।' গো ধরল পলাশও।

'বিমান থেকে দুম করে যখন একটা বোমা ফেলবে তখন বুঝবি মজা।' বলে লামিয়া ওদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ওরা ভয় পায় না। কারণ তাদের বাবা বলেছেন এগুলো ভারতীয় বিমান। এরা আমাদের পক্ষে আছে। সুতরাং ওরা জানে এগুলো ওদের উপর বোমা ফেলবে না।

আমি নিশ্চয়ই পাক হানাদারদের নাস্তানাবুদ করে দিতাম।' বলল শিমুল।

'তোরা মিলিটারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবি!' বলে হাসতে লাগল লামিয়া।

'হেসো না আপু। বাবা বলেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আছেন। তারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ইশ, আমরা যদি সেই সুযোগ পেতাম।' বলে আফসোস করে শিমুল।

লামিয়া বুঝল সে ওদের সাথে কথায় পারবে না। তাই সে ছাদ থেকে নেমে গেল। দুই ভাই ছাদে বসে গল্প করতে লাগল।

'ভাইয়া, চল, আমরা বাসা থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে যাই।' প্রস্তাব করল পলাশ।

'কিন্তু আমরা তো কিছু চিনি না। কোথায় যাব, কীভাবে যাব; কিছুই তো জানি না। যদি জানতাম তাহলে যেতাম।' বলল শিমুল।

'তাহলে কী উপায় ভাইয়া?'

'কিছু করার নেই। ছোটো চাচা আর মেজো চাচা না বলেই যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। তাতে দাদা আর দাদির অবস্থা তো দেখছিসই। আমরাও যদি না বলে চলে যাই, তাহলে বাড়ির সবাই ভেঙে পড়বে। তার চেয়ে আমরা মনে মনে কঠিনভাবে এই যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত থাকি।'

'সেটা কীভাবে ভাইয়া?'

'আমি আমার মনের মধ্যে একটি স্বাধীন দেশকে ধারণ করছি প্রতিনিয়ত। জানি এই যুদ্ধে আমাদের অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। তবুও আমার মনে দৃঢ় আশা একদিন আমাদের দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে স্বাধীন হবে। আমাদের মুখে আবার হাসি ফুটবে। আমরা একটি স্বাধীন দেশ পাবো, পাবো একটি ঝলমলে উজ্জ্বল পতাকা।' বলতে বলতে শিমুলের চোখে-মুখে যেন অন্য এক আলো খেলা করতে লাগল। সেই আলো বাংলার দামাল ছেলেদের বিজয়ের আলো। সেই আলো স্বাধীনতার আলো।

আজ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল।

ভোরবেলা চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল পলাশ আর শিমুলের। এত সকালে কী হলো আবার? ভাবতে ভাবতে চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানায় উঠে বসল দুই ভাই।

তারা যা দেখল তাতে তাদের চোখ ছানাবড়া। কারণ তাদের বাড়িতে একজন মুক্তিযোদ্ধা এসেছে। তার হাতে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল। গাল ভর্তি চাপদাড়ি। পরনের কাপড় ময়লা।

তাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদছেন দাদা-দাদি, বাবা-ফুপু। হঠাৎ করেই মুক্তিযোদ্ধাকে চিনতে পারল শিমুল। আরে! এ যে তার রিয়াজ চাচা। ছুটে গিয়ে সে চাচার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পলাশও ছুটে এসেছে।

মেজো চাচা দুইজনকে চ্যাংদোলা করে কোলে নিয়ে নিলেন। সে এক বিরাট আনন্দঘন মুহূর্ত। সেই খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল ওদের মহল্লায়। আশপাশে যারা ছিল তারা ছুটে এল মেজো চাচাকে এক নজর দেখতে।

এক ফাঁকে শিমুল মেজো চাচার রাইফেলটা তুলে নিল। উফ, কী ভারি! সেই রাইফেল নিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিমুলের। পলাশও ধরতে চাইছে রাইফেলটা। মেজো চাচা কাছাকাছিই ছিলেন। তিনি

ভাস্তেদের রাইফেল নিতে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন।

'বল, জয় বাংলা।' চিৎকার করে উঠলেন মেজো চাচা।

'জয় বাংলা।' পলাশ আর শিমুল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

তাই শুনে ছুটে এলেন ওদের মা। 'ওরে তোরা চুপ কর। আশপাশে মিলিটারি থাকলে ওরা ছুটে আসবে। ভয়ংকর বিপদ হবে!'

'কিচ্ছু হবে না ভাবি, বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।' বলে উঠলেন মেজো চাচা।

পলাশ আর শিমুল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে- জয় বাংলা, জয় বাংলা।

পরদিন সকালে বিজয়ের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। মানুষ খুশিতে পাগলের মতো নেমে এল রাস্তায়। আনন্দে তারা কী করবে ভেবে পেল না। যার যেমন খুশি করছে। মানুষ নাচছে, গাইছে, লাফাচ্ছে, শ্লোগান তুলছে। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র থেকে ফাঁকা আওয়াজ করছে। চারদিকে বাঁধভাঙা খুশির বন্যা।

ঠিক সেই সময় একটি খবর এল শিমুলদের বাড়িতে। তার ছোটো চাচা মিরাজ আর বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেছেন।

বিশাল এক খুশির দিনে শোকের ছায়া নেমে এল ওদের পরিবারে। ছোটো চাচার কথা মনে হতেই ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল শিমুলের চোখ দিয়ে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সে তার ছোটো চাচাকে দেখতে পেল। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে সে। তার হাসি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ জুড়ে। অজান্তেই মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেল শিমুলের হাত। সে আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, জয় বাংলা!

সবাই অবাক হয়ে শিমুলের দিকে তাকালো। ভাবছে শিমুলের কী হলো? ❑

গল্পকার

আমাদের দেশ

সানোয়ার কবীর

আমাদের দেশ
সোনার ছবি
কবিতা ও গানে
লিখেছেন অনেক কবি।

দেশটা লাল-সবুজের
রঙিন উদার জমিন,
শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়
গর্ব অন্তহীন।

লাখো শহিদের রক্তে ভেজা
আমার পতাকা,
স্বাধীন মানচিত্র
হৃদয় মাঝে আঁকা

একাদশ শ্রেণি
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও।

বিজয়ের হাসি

নাহিদা সুলতানা

বিজয় মানে মুক্ত জীবন
আনন্দ উল্লাস

বিজয় মানে নিজ ভূমে
স্বাধীন বসবাস।

বিজয় মানে নির্ভয়ে কথা বলা
নিজের পথে চলা।

বিজয় মানে সবুজ জমিনে
প্রজাপতির উড়াউড়ি

বিজয় মানে হাসির সুরে
বাজল জয়ের নিশান।

বিজয় মানে আত্মত্যাগ
স্বাধীনতার অমোঘ বাণী।

৮ম শ্রেণি, কদমতলা হাই স্কুল, বাসাবো

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

নুসরাত জাহান

চৌদ্দই ডিসেম্বর দিনটি বাঙালি জাতির জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির দিন। প্রতিবছর এই দিনটিকে আমরা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, হিসেবে পালন করে থাকি। সাধারণত আমরা বুদ্ধিজীবী বলতে যে-কোনো দেশে চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর শ্রেণিকেই বুঝে থাকি। তাঁরাই মূলত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সাধারণ অর্থে– শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী-যাঁরা বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে আবেগপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা। দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত লড়াই। এই লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয় বাঙালি জাতি। অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা, আত্মদান ও দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ সময়ে স্বাধীনতার মাত্র দুইদিন আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের সেরা সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। ঘাতকদের হাতে সেদিন দেশের যেসব সূর্য সন্তান হত্যাকাণ্ডের স্বীকার হয় তাদের মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা ও ফজলে রাব্বী অন্যতম।

পরাজয় অনিবার্য ভেবে হানাদাররা রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এর মূল কারণ ছিল বাঙালি জাতি যাতে বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। বীর বাঙালির সাহস ও মেধার কাছে যখন একে একে

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প, আস্তানা নিশ্চিহ্ন হতে লাগল, শত্রুবাহিনী একে একে আত্মসমর্পণ করতে লাগল, তখনই হানাদার বাহিনী এদেশের সেরা বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের গোপন আবাস থেকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। এরপর প্রথমে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আলবদর ঘাঁটিতে স্থাপিত টর্চার সেন্টারে নির্মম দৈহিক নির্যাতনের পর রায়ের বাজার বধ্যভূমি ও মিরপুর গোরস্থানে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর আলবদর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে একই কায়দায় নির্যাতন করে। যা ছিল ইতিহাসের একটি জঘন্যতম ও নিষ্ঠুরতম ঘটনা।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিশেষত বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। তাই স্বাধীনতার পর তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই ভাবনা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে মিরপুর বধ্যভূমিতে পাওয়া বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের লাশ দাফন করা হয়। প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করার উদ্যোগও নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণ এবং জগন্নাথ হল গণকবরে পুষ্প অর্পণ, মিরপুর, মোহাম্মদপুর বধ্যভূমিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন চালু হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

সম্পাদক, নবারুণ

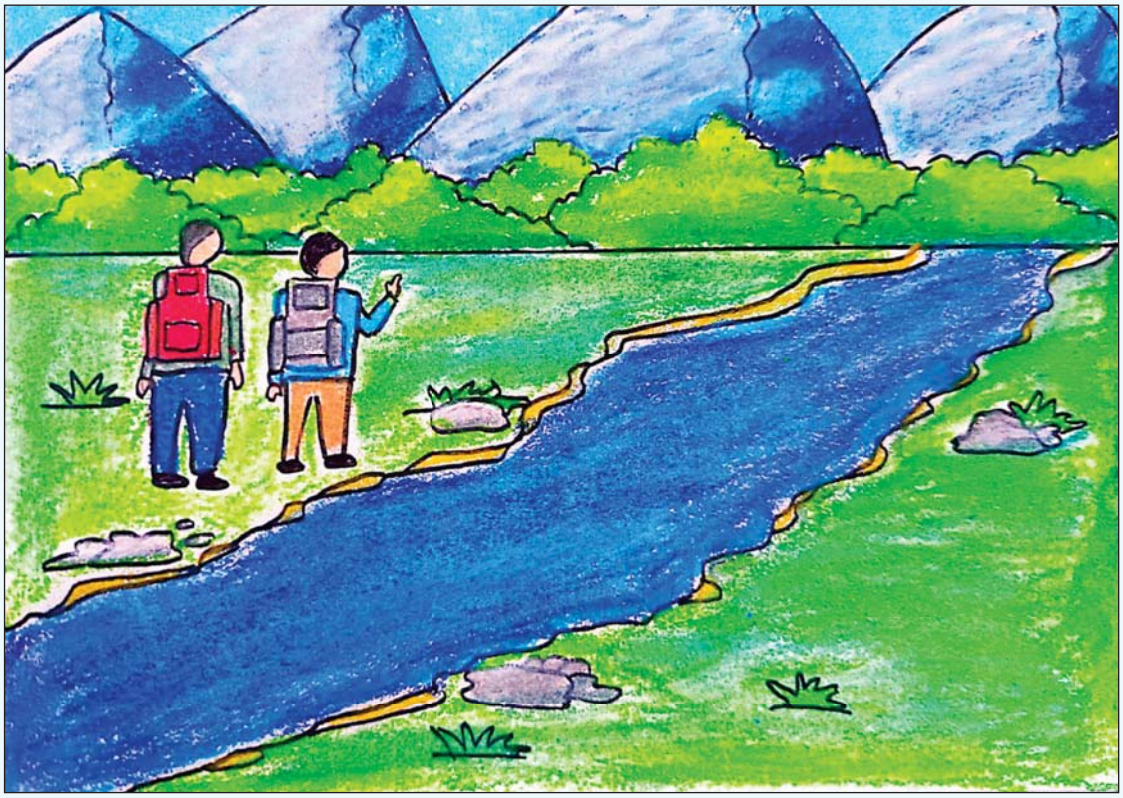

রিয়ন দত্ত, পঞ্চম শ্রেণি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গল্প

স্বাধীনতার সুখ

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

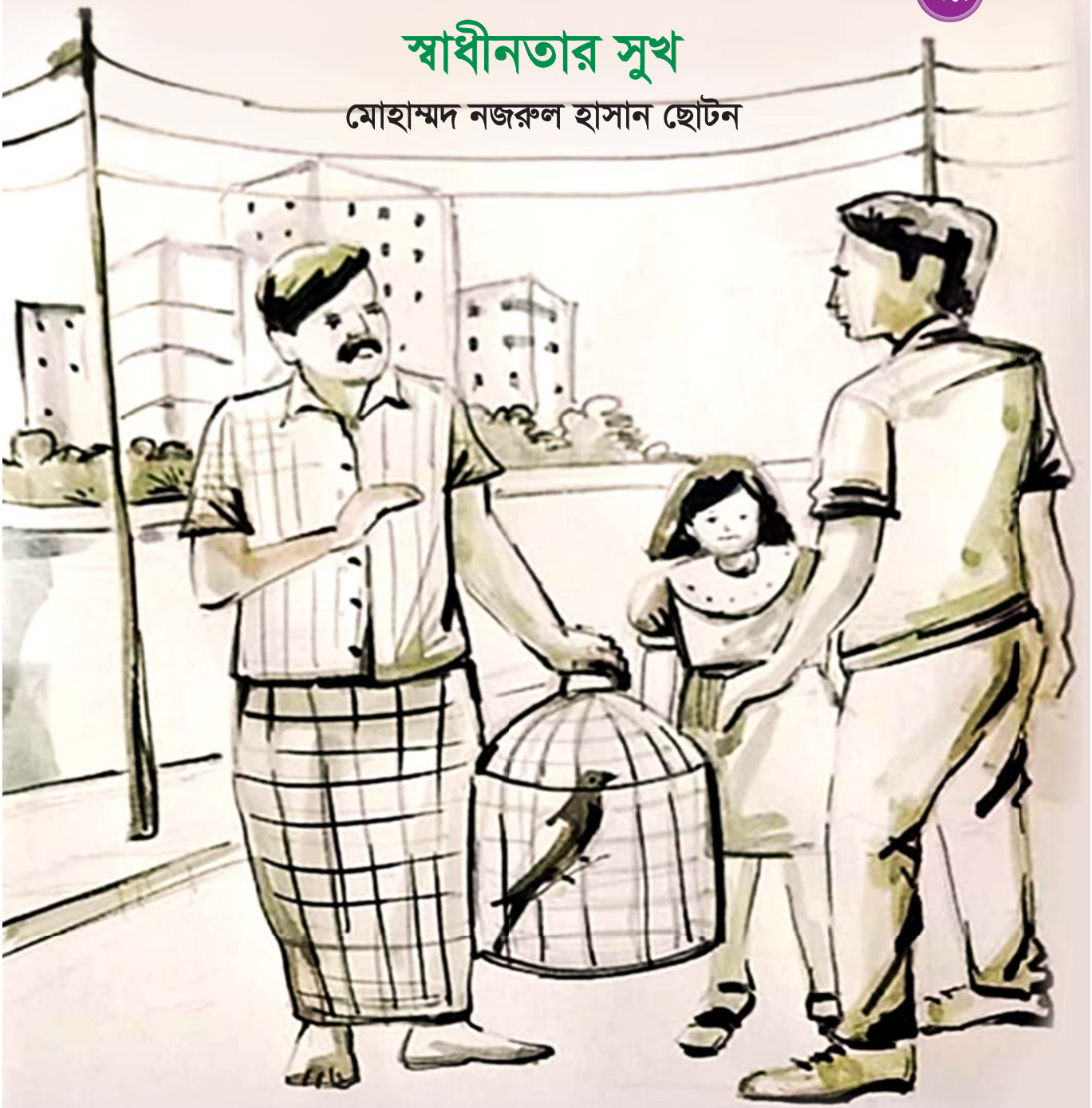

ছোটোবেলা থেকে মলির অভ্যাস ছিল যখন যা ইচ্ছে হবে তাই করবে। একসময় পুতুল খেলার প্রতি ওর খুব ইচ্ছে ছিল। সারাক্ষণ পুতুল নিয়ে খেলা করত। মা মাঝে মাঝে রাগ হয়ে ধমক দিত। কিন্তু বাবা কিছু বলত না। একমাত্র মেয়েকে তিনি কিছু বলতে নারাজ ছিল। এজন্য মলির মা বলত, বাবা আর মেয়ে মিলে একত্রেই পুতুল খেলতে বসে যাও।

বাবা বলত, মলি আমাদের একমাত্র মেয়ে। ওকে যদি ওর ইচ্ছেমতো চলতে না দেই, ওর চোখে যদি পানি দেখি, তাহলে আমার শান্তি লাগে না।

মা তখন বলত, থাক থাক অনেক হয়েছে। তোমার মেয়ের ইচ্ছেই পূরণ করো।

গত দু'বছর পর মলির ইচ্ছেটি হঠাৎ করে পালটে গেল। সে এখন এক্কা-দোক্কা খেলা নিয়ে ব্যস্ত পাশের বাসার মিনির সঙ্গে। সারাদিন কেবল এক্কা-দোক্কা আর কানামাছি খেলবে।

নতুন কোনো খেলা চোখের সামনে দেখলে মলি সে খেলাটিই করবে। যেমন মামাতো বোনকে দেখে ইচ্ছে হলো পুতুল খেলার। আবার পাশের বাসার মিনিকে এক্কা- দোক্কা ও কানামাছি খেলতে দেখে পুতুল খেলা ভুলে আকৃষ্ট হলো সেই খেলার প্রতি। এভাবেই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান মলির দিন কাটছে।

কিছুদিন হলো মলির জ্বর হয়েছে। মা মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে বলল, সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। এখন বোঝ মজা !

মলি বিছানায় শুয়ে মাকে কিছু বলতে পারে না । শুধু লজ্জা পায়। এ সময় বাবা এসে বলল, মলিকে ঢাকায় নিয়ে যেতে হবে। এখানে তেমন ভালো ডাক্তার নেই।

পরদিন মলির বাবা মেয়েকে ঢাকায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার মলিকে দেখে বলল, ওর জ্বর তেমন একটা জটিল নয়। অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে এ জ্বর হয়েছে। আমি ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি। তা খেলেই ভালো হয়ে যাবে।

তারপর মলি বাবার সাথে ডাক্তারখানা থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলে আসে।

পথে মলির চোখে পড়ল, একটি লোক চারটি পাখি খাঁচাতে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে মলি বাবাকে বলল, বাবা আমাকে ওই লোকটির কাছে নিয়ে যাও। তার সাথে কথা বলব।

মেয়ের কথানুযায়ী বাবা মেয়েকে লোকটির কাছে নিয়ে যায়। মলি লোকটিকে বলল, আপনি কি পাখি বিক্রি করেন?

লোকটি এক গাল হেসে বলল, জ্বি বোন।

মলি তখন বাবাকে বলল, আমাকে কয়েকটি পাখি কিনে দাও না । আমি পাখি পুষব।

বাবা বলল, তোমার জ্বর এখনো ভালো হয়নি। আগে জ্বর ভালো হোক। পরে তোমাকে পাখি কিনে দিব।

মলি বাবার কথায় চুপ করে রইল। তারপর তারা ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে এল।

দু'দিন পর মলির জ্বর ভালো হলো। এখন তার আবদার হলো পাখি কেনার। সে পাখি পুষবে। প্রতিদিন বাবাকে কথাটি মনে করিয়ে দেয়। বাবা আমার জ্বর ভালো হয়ে গেছে। তুমি এখন পাখি এনে দাও।

বাবা মেয়ের আবদার রক্ষা করতে, মেয়েকে দুটি টিয়ে পাখি এনে দেয়।

মলি বলে, বাবা আরও দুটি টিয়ে এনে দাও। তোমার কাছে আর কিছু চাইব না। বাবাও মেয়েকে আরও দুটি টিয়ে এনে দেয়।

মলি এখন এই চারটি টিয়ে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। সারাক্ষণ টিয়েগুলোর দেখাশোনা করে। স্কুলে যাবার আগে দারোয়ান রহমতকে টিয়েগুলোর প্রতি যত্ন নিতে ও ঠিকমতো খাবার দিতে বলে যায়। আবার স্কুল থেকে এসে টিয়েগুলোকে ঠিকমতো খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা, ওরা ঠিকমতো খেয়েছে কিনা তা রহমতকে জিজ্ঞেস করে। রাতে ঘুমাবার আগে রহমতকে বলে, টিয়েগুলোকে দেখাশোনা করতে। হুলোবিড়ালটি এসে যেন ওদের কোনো বিরক্ত না করে তা দেখতে বলে।

মলির কথামতো রহমত সারারাত লাঠিটি হাতে রাখে। যেন হুলো বিড়ালটি টিয়েগুলোর খাঁচার দিকে আসতে না পারে। বাবা বাজারে যাবার সময় মলি টিয়েগুলোর জন্য কলা কিনে আনতে বলে।

মলির বাবা-মা মেয়ের এসব কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। তবে মা মাঝে মাঝে রাগও হয়ে যায়। তিনি মলির বাবাকে বলে, মেয়ে যখন যা চায়, সেটাই এনে দেয়। আর মেয়েও তখন সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পড়াশুনার দিকে একেবারে খেয়াল রাখে না।

এভাবে কয়েক মাস গেল। মলি তার টিয়েগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। ওদের সাথে কথা বলে। গুনগুন করে গান শোনায়। কলা ছুলে দেয় খাবার জন্য।

কয়েকদিন যাবত দেখা গেল খাঁচার একটি টিয়ে কেমন যেন রোগা হয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই টিয়েটাকে কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। টিয়েটা শুধু ডানা দুটো মেলে ঝাঁপটাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন খাঁচা থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে। মলি টিয়েটার এই দুরাবস্থা দেখে বাবাকে গিয়ে বলে।

বাবা এসে বলে, ওকে খাঁচা থেকে বের করে দাও।

মলি রহমতকে দিয়ে সেই টিয়েটাকে খাঁচা থেকে বের করে দেয়। তবুও দেখা গেল, খাঁচা থেকে বের হয়েও টিয়েটা উড়তে পারছে না ! কেবল ঝিমুচ্ছে !

বাবা তখন বলল, মলি রাত হয়ে গেছে । এখন তোমার রুমে চলে যাও। রহমত ওর দেখাশোনা করবে। সকাল হলে তুমি আবার এখানে চলে এসো। মলি তখন বিষণ্ন মনে ঘুমাতে চলে যায়।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে জেগেই মলি দৌড়ে টিয়েগুলোর খাঁচার কাছে এসে পড়ে। দেখে, সেই টিয়েটা মারা গেছে। মলি তখন কাঁদতে থাকে। বাবা এসে মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়, কান্না থামায়। তিনি বলেন, মলি আজ বিকেলে আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। এখন আর কেঁদো না । আমি এখন অফিসে যাচ্ছি।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাবা মেয়েকে নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। তিনি মলিকে বলেন, তোমার কদিন আগে জ্বর হয়েছিল না?

জ্বি বাবা।

তখন তোমার কেমন লেগেছিল ?

খুব খারাপ লেগেছিল। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে আর ভালো লাগছিল না।

তখন তুমি কী বলেছিলে ?

আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে বলেছিলাম। কারণ স্কুলে যেতে পারতাম না বলে ঘরে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

আর কী বলেছিলে ?

আমি যেন কোথাও বন্দি হয়ে আছি।

মলির বাবা এবার বলল, এখন আমি তোমাকে কিছু কথা বলি। তুমি এখন বড়ো হয়েছ। বুঝতে চেষ্টা করো। এই যে টিয়েগুলো খাঁচায় বন্দি হয়ে আছে ওগুলোও কিন্তু খাঁচার ভিতরে থাকতে চায় না। ওদের দুটো ডানা আছে। সেই ডানা মেলে ওরা মুক্ত পরিবেশে উড়ে বেড়াতে চায়। খাঁচার ভিতরে বন্দি থাকলে ওদের ডানাকে ওরা ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া মুক্ত আলোর পরিবেশে উড়তে না পারায় ওদের শরীর রোগা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওরা মারাই যায়। মুক্ত আলোর পরিবেশে ডানা মেলে স্বাধীনভাবে উড়তে পারাটাই ওদের সুখ ও আনন্দ! ওরা পরাধীন থাকতে চায় না।

মলি বলল, বাবা আমি তোমার কথাগুলো বুঝেছি। কালকেই আমি ওই তিনটে টিয়েকে খাঁচা থেকে বের করে ছেড়ে দিব।

বাবা দেখল, মেয়ে তার কথা বুঝতে পেরেছে। তাই তিনি মনে মনে খুশি হয়ে মেয়েকে ধন্যবাদ দিলো।

পরদিন ভোরে বাবা আর মেয়ে টিয়েগুলোকে নিয়ে ছাদে চলে এল। বাবা বলল, মলি তোমার হাত দিয়ে ওদের ছেড়ে দাও।

মলি তখন খাঁচা থেকে একটি একটি করে টিয়ে বের করে ছাড়তে লাগলো। সত্যিই দেখা গেল, খাঁচাতে থাকতে ওরা কেমন লাফাচ্ছিল। আর আজ ওদের খাঁচা থেকে বের করা মাত্রই ওরা কেমন ফুড়ুৎ করে উড়ে আাকাশের সীমানায় চলে গেল। মনে হলো, ওরা যেন কতদিন যাবত আকাশ দেখতে পায়নি। ওরা যেন কোনো বন্দিখানাতে বন্দি হয়েছিল। আজ যেন ওরা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়েছে।

মলি ওদের এই স্বাধীনতার সুখ ও আনন্দ দেখে খুব খুশি হলো ।

যদিও ওদের ছেড়ে দেবার কারণে মলির দু'চোখে অশ্রু ছলছল করছিল। ❑

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

আয়েশা উমামা, প্রথম শ্রেণি, দারুস সাফা ইসলামীয় মাদ্রাসা, ঢাকা

গল্প

বোবা রোবট

নাজমুল হুদা

হঠাৎ বাসায় বড়োসড়ো একটা প্যাকেট এল। বাইরে দেখে বোঝার উপায় নেই ভিতরে কী। জিনিয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বড়ো চাচা ড. রইস উদ্দীন তার এক ছাত্রের মাধ্যমে জাপান থেকে পাঠিয়েছেন। প্যাকেট খুলতেই বেড়িয়ে এল জাপানি রোবট। নাম 'ফুকুমি'। জিসান জিনিয়া দুজনই আনন্দে মাতোয়ারা। ভীষণ উত্তেজনা বাসা জুড়ে। ভোর হলো দোর খোলো, 'ফুকুমি' ওঠরে... গেয়ে জিনিয়ার দিন শুরু হয়। এরপর ফুকুমিকে ঘিরেই সারাদিনের ব্যস্ততা। জিনিয়ার চেয়ে সাড়ে চার বছরের বড়ো জিসানও যোগ দিয়েছে ওর সাথে। ওদের আদিখ্যেতা দেখে মা আফরোজা বেগম সতর্ক বাণী দিয়েছেন-'সারাদিন রোবট নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে না, পড়াশোনা করতে হবে। না হলে রোবটের ঠিকানা হবে ডাস্টবিনে'।

মা'র কথা শুনে জিনিয়া গাল ফুলিয়ে থাকে। জিসান ভাবছে রোবট নিয়ে আর কী করা যায়। গুগল ঘেটে রোবটের আদ্যোপান্ত উদ্ধারে নেমেছে। বড়ো চাচার সাথেও কথা বলেছে। জিনিয়াকেও এটা-সেটা শোনায় সে।

-'জানিস, জাপানে প্রতি বছর রোবটিকস মেলা হয়। বড়ো চাচা মনে হয় সেখান থেকেই ফুকুমিকে কিনেছেন'।

-হতে পারে, তবে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেছে।

-তবুও ভালো, জন্মদিনে রোবট তো পেলি। এজন্যই বলে সবুরে মেওয়া ফলে।

-তোমার কি হিংসে হয় ভাইয়া?

-কী যে বলিস জিনিয়া, এতে তো আমারই লাভ, ফ্রি ফ্রি অনেক কিছু জানা হয়ে যাচ্ছে।

বাবা মহিউদ্দীন কান পাতেন জিসানের রোবোটিক আলোচনায়। কাছে এসে বললেন 'আমাদের শিশুবেলায় দেখতাম পুতুল নিয়ে খেলতে আর তোমরা এখন রোবট নিয়ে খেলছ। কত পরিবর্তন সময়ের সাথে! আরো কত কী যে নতুন দেখব'।

বাবার কথার মাঝে জিসান বলে ওঠে- 'না বাবা এগুলো জাপানে নতুন কিছু নয়। ওরা অনেক আগ থেকেই এসব নিয়ে কাজ করছে। আমাদের দেশের যখন জন্ম, সেই ১৯৭১ সালে জাপানিজ রোবট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ভাবতে পারো।

-এজন্যই তো জাপানিরা এত উন্নত, এত এগিয়ে এখন তো ওখানে এগুলো আসলেই খেলনার মতো হয়ে গেছে।'

আফরোজা বেগম চোখ বড়ো করে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল-'আরে তুই কদিনের পুঁচকে ছেলে, এতসব জানলি কেমন করে?

-'বড়ো চাচার সাথে কথা হয়েছে মা। পড়াশোনাও করেছি, ইন্টারনেট ঘেটেছি'।

-তোর তো শুধু এটা সেটা পড়াশোনা। ক্লাসের বই তো ঠিকমতো পড়িস না। ভালো ফলাফল না করতে পারলে বুঝবি মজা..

মহিউদ্দীন সাহেব আফরোজা বেগমের কথা থামিয়ে দিলেন। নিজেও আর কথা বাড়ালেন না। সন্তানের নানামুখী চিন্তাভাবনা তার ভালো লাগে, গর্ব হয়। সারাদিন অফিসের কাজের চাপ সামলে রাস্তার জ্যামের বিরক্তি ঠেলে বাসায় এসে তেমন কথা বলা হয়ে ওঠে না। মোবাইলে কারো সাথে কথা হয়ে ওঠে না। বড়ো ভাই রইসদ্দীন একযুগ ধরে জাপানে। মায়ের মৃত্যুর খবরে সর্বশেষ সাত বছর আগে দেশে এসেছিল। জিনিয়ার জন্য জাপানি রোবট পাঠিয়েছে দেখে খুব ভালো লাগল মহিউদ্দীন সাহেবের। জিসান, জিনিয়া জাপানি রোবটাকে নিয়ে আর কী কী করে সেটাই দেখার বিষয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই জিসানের স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল ফুকুমির খবর। অনেকে টিপ্পনি কাটে। দেখার আগ্রহ দেখায়। সামনে স্কুলে বিজ্ঞান মেলা। প্রতি বছরই বিজ্ঞান মেলায় জিসানরা তিন বন্ধু মিলে নতুন কিছু নিয়ে হাজির হয়। এবারে প্রস্তুতি নিতে পারেনি। শেষমেষ ফুকুমিকে মেলায় হাজির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিসান। বিজ্ঞান স্যার শুনে স্বাগত জানালো। হেডস্যারের অনুমতি নিতে বলল। জিসান নিজেই গেল পোদ্দার স্যারের কাছে। রোবটের পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলে অনুমতি চাইল। স্যার সানন্দে রাজি হলেন। বললেন- 'আইডিয়াটা মন্দ না। সবাই মজাও পাবে।' মৌখিক অনুমতি পাওয়া গেল। বিজ্ঞান স্যারকে উনি কড়াভাবে বলে দিলেন যাতে রোবটটির জন্য আলাদা একটি স্টল রাখা হয়। সাথে আরেকটা নতুন প্রস্তাব আসলো সেটা হলো উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা হবে। যারা রোবট দেখতে আসবে তাদের কিছু প্রশ্ন করা হবে, বিজয়ীদের জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বক্তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানানো হলো।

সব ক্লাসে কুইজের ঘোষণা দিয়ে দিলেন বিজ্ঞান স্যার। তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত পুরো ব্যাপারটায়। নিজেই প্রশ্ন তৈরির দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। আস্তে আস্তে পুরো বিজ্ঞান মেলার আলোচনা রোবটের দিকে মোড় নিতে শুর করল। জিসানের আনন্দ বেড়ে গেল। মনে নানা প্রশ্নও উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। অন্যরা কী বলবে। রোবটটা কেমন পারফর্ম করবে এসব নানা ভাবনায় রাতে ঠিকমতো ঘুমই আসলো না জিসানের। ওদিকে বিজ্ঞান স্যারেরও ঘুম হারাম। একে তো বিজ্ঞান মেলার খুঁটিনাটি সামলানো, তার ওপর কুইজের প্রশ্ন তৈরি করার বাড়তি দায়িত্ব। মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন তৈরির কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছুই জানা হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান মেলার উদ্‌বোধনী মঞ্চের বাম পাশটায় ফুকুমিকে রাখা হয়েছে। সকালের সূর্যালোকে রোবটের চেহারা চকচক করছে। আগত সবার দৃষ্টি ফুকুমির দিকে। কেউ হাত বাড়ালে সেও হাত

বাড়াচ্ছে। হাতে বিশেষ সার্কিট দেওয়া। তুলতুলে, পরির মতো। সাথে একটা ছোটো সেন্সর লাগানো। হাসি দেয়। ইঙ্গিতও করে। শুধু কথা বলতে পারে না। 'বোবা রোবট' বলে জিসানের বন্ধুদের কেউ কেউ বিদ্রুপ করল। একদল দুষ্টু বন্ধুর প্রচারণায় স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল 'বোবা রোবটের খবর'। এসব অপপ্রচারে জিসানের মন ভার হয়ে উঠল, উৎসাহে ভাটা পড়ল। বোবা রোবটের অপবাদ পেয়ে জিসানের ইচ্ছে করছিল ফুকুমিকে নিয়ে বাসায় চলে যেতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিরা চলে আসলেন। শুরু হলো মেলার আনুষ্ঠানিকতা। হেডস্যারের উদ্‌বোধনী ভাষণের পরই অতিথি বক্তা অধ্যাপক ড. খোন্দকার-ই রব্বানী কথা বলা শুরু করলেন। স্যার শুরুতেই সবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব ছুড়ে দিলেন 'তোমরা কে কে রোবট নিয়ে পড়াশোনা বা কাজ করতে চাও? হাত তোলো দেখি'। কেউ হাত তুলল না। ভয়ে অথবা না বুঝে। স্যার আবার বললেন 'তোমরা কারা গণিত, পদার্থ বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ আগ্রহী? এবার অনেকেই হাত তুলল। স্যার মৃদু হেসে মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নিয়ে বলা শুরু করলেন 'শোনো, রোবটদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রোগ্রাম দিয়ে। আর রোবট ডিজাইন, চালনা বা প্রোগ্রামিংয়ের জন্য চাই গণিতে শক্ত ভিত ও ভালোবাসা। সেইসঙ্গে প্রয়োজন ইলেকট্রনিকস শেখার আগ্রহ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সৃজনশীলতা, যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা ও তত্ত্বীয় জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়নের মানসিকতা'।

স্যারের কথা এখন কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীদের মগজে ঢুকছে। বোধ হয় বুঝতেও পারছে। অনেকের চোখ চকচক করছে। স্যার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আবার বলা

শুরু করলেন 'তোমরা যারা এই বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাও, উচ্চশিক্ষা নিতে চাও তাদের জন্য বলছি বর্তমানে বাংলাদেশে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিসহ সরকারি-বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রোবটিকস পড়ানো হচ্ছে। আর যারা ছোটো বয়স থেকেই এ বিষয়ে কাজ করতে চাও তাদের জন্য ধানমন্ডির একটি পুরোনো ভবনে গড়ে উঠেছে 'রোবোল্যাব'। রোবোল্যাবে শিশুদের রোবোটিকস, ইলেকট্রনিকস, মেকানিকস ও প্রোগ্রামিং শেখানো হয়। শিশুরা সবাই রোবট বানানো শিখছে। সেখানে ছোট্ট শ্রেণিকক্ষে শিশু-কিশোররা ব্যস্ত থাকে নিজ নিজ প্রকল্প নিয়ে। তাদের সামনে কোনো বই নেই। আছে রোবট, ল্যাপটপ, ব্যাটারি, স্পিকার, বিভিন্ন ধরনের তার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। আরেকটি কথা-কথাটি আমার নয়, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সমীক্ষা বলছে, ২০২২ সাল নাগাদ সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কাজ নিয়ে নেবে রোবট, তবে একই সঙ্গে প্রায় ১৩ কোটি ৩০ লাখ মানুষের নতুন কর্মবাজার তৈরি হবে। সুতরাং তোমরা তৈরি হও আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়।'

রব্বানী স্যার বক্তব্য শেষ করতে যাচ্ছিলেন। পাশ থেকে বিজ্ঞান স্যার চিরকুট ধরিয়ে দিলেন। রব্বানী স্যার চিরকুট হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন 'একজন ছাত্র জানতে চেয়েছে- রোবট কি কথা বলতে পারে, বিস্তারিত জানতে চাই।'

প্রশ্ন শুনে বুঝে গেলেন প্রশ্নটি জিসানের। ফুকুমিকে বোবা রোবট উপাধি দেওয়ায় হতাশায় জিসান এ বিষয়ে জানতে ও সবাইকে জানাতে বিজ্ঞান স্যারকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে। উত্তরে স্যার জানালেন 'রোবটরা অবশ্যই কথা বলতে পারে। এজন্য রোবটে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, সেন্সর ও অনুভূতি প্রবণতা থাকতে হয়। তবে বেশিরভাগ রোবটে এই ব্যবস্থা থাকে না বলে কথা বলতে পারে না। তোমরা নিশ্চয়ই রোবট সোফিয়ার নাম শুনেছ। বাংলাদেশেও এসেছিল। সে বাংলাও বলতে পারে। সেভাবেই প্রোগ্রামিং করা।'

অতিথি বক্তার কথার পরেই শুরু হলো কুইজ। বিজ্ঞান স্যার এসে প্রশ্ন শুরু করলেন। যারা পারবে হাত ওঠাতে হবে। যাকে বলা হবে সেই উত্তর দেবে। প্রথম প্রশ্ন– 'গান গাইতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে সম্প্রতি মানব সদৃশ এমন একটি রোবট যুক্ত করেছে বসনিয়ার একটি জনপ্রিয় রক ব্র্যান্ড। বলতে হবে ব্যান্ডের নাম কী?

কেউ হাত তুলল না। স্যার নিজেই স্বীকার করলেন প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেছে। সেই ব্যান্ডের নাম 'দুবিজা কোলেকটিভে'।

পরের প্রশ্ন 'রোবট ব্যবহার করে কোন দেশ বয়স্কদের সেবা দেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করার কাজ করছে?

এবার জিসান হাত তুলে ঝটপট উত্তর দিয়ে দিল– জাপান।

স্যার সবাইকে হাততালি দিতে বলে বললেন 'উত্তর' সঠিক হয়েছে। জাপানের ১৫টি কোম্পানির প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞরা মিলে বয়স্কদের সেবা দেওয়ার জন্য ১০টি বাড়ি বেছে সহায়তা করছে। যারা বিছানা থেকে উঠতে পারে না বা চলাচল করতে পারে না, তাদের কোনো সহায়তা দরকার হলে অ্যান্ড্রয়েডের মাধ্যমে খুব সহজেই সেবা দেওয়ার কাজটি করা হচ্ছে।'

বিজ্ঞান স্যার নিজ থেকেই আরো যোগ করলেন 'তবে জাপানে বিশালাকৃতির দানবীয় রোবট আবিষ্কার হচ্ছে। আটাশ ফুট সাত টন ওজনের এই রোবটটি বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তারা। ঘণ্টায় এক কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন রোবটটি সামনে ও পেছনে সমান দক্ষতায় হাঁটাচলা করতে পারে। রোবটটির হাতে রয়েছে বিশালাকার বন্দুক। বন্দুক থেকে বুলেট নয়, বের হয় ছোটো ছোটো বল।'

রোবটের হাতের বন্দুক থেকে বল বের হয় শুনেই ছাত্রছাত্রীদের মুখে হাসির রোল পড়ে গেল।

স্যার আবার প্রশ্ন করলেন 'বলতে হবে শিশুর প্রথম প্রকৃত বন্ধু-রোবট কোনটি?

একজন ছাত্র হাত তুলে বলে উঠল 'ড্যাশ রোবট স্যার'।

স্যার চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন- 'সঠিক উত্তর. তালি'।

বিজ্ঞান স্যার উত্তরের সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করে বললেন 'আট বছর বা তার চাইতে বেশি যে-কোনো বয়সের শিশুর জন্য তৈরি করা হয়েছে এই রোবট। শিশুর খেলাধুলার সঙ্গী হিসেবে আবার সৃজনশীল সমস্যার সমাধান বা গাণিতিক চিন্তা পদ্ধতির মতো বিষয়েও শিশুকে অভ্যস্ত করে তুলতে কাজ করবে এই রোবট'।

সবচেয়ে ছোটো রোবট কোনটা? স্যারের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে দিল সবুজ টিশার্ট পড়া এক ছাত্র। বিজ্ঞান স্যার আবার উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন- 'দারুণ উত্তর, সবচেয়ে ছোটো রোবটের নাম 'বেনকিউ'। এটি সবুজ রঙের ছোটো আকৃতির একটি রোবট। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে কেমন আছো বেনকিউ? 'আজ তুমি কী খেয়েছ? পাখিরা আকাশে ওড়ে কীভাবে? এমন হাজারও প্রশ্নে একটুও বিরক্ত হয় না বেনকিউ। সহজ-সরল ভাষায় প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে রোবটটি।'

-'তাহলে তো বেনকিউকে আনলে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সব পুরস্কার জিতে নিত।' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছাত্র বলে উঠল। তার কথায় সবার মধ্যে হাসির ঢেউ জেগে উঠল। জিসানের মাথায় অবশ্য নতুন একটা ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। ফুকুমিকে কীভাবে কথা বলানো শেখানো যায়। সম্ভব হলে 'বেনকিউ' এর মতো সবজান্তা রোবটও বানিয়ে ছাড়বে। কাজটা সহজ নয়। তবে ফুকুমিকে 'বোবা রোবট' অপবাদ দেওয়ায় জিসানের জেদ চেপেছে, বাস্তবায়ন করেই ছাড়বে। শুধু অপেক্ষার পালা। ❑

প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ

শহীদুল্লাহ শোভন

যে দিক তাকাই দুই চোখেতে
লাগছে ভীষণ ঘোর।
হোক না সকাল মধ্য দুপুর
কিংবা রাত্রি ভোর।

সূর্য বুকে আলোর মিছিল
শিশির ভেজা ঘাস।
পাখির ডাকে স্নিগ্ধ সকাল
নিত্য ইতিহাস।

ভর দুপুরে ঝিলের জলে
হিজল ফুলের সুখ।
রেশমি দিদির জলকেলিতে
ডাহুক লুকায় মুখ।

বাউল মাতাল জোছনা আলো
ছুটছে জোনাক দল।
নিশি জাগা ফুলের সুবাস
নেশায় টলমল।

ঘুম কাতুরে মোরগ ডাকে
হিম ধুয়াশার রেশ।
নিত্য নতুন দেখি আমার
সোনার বাংলাদেশ।

রূপকথার গল্প

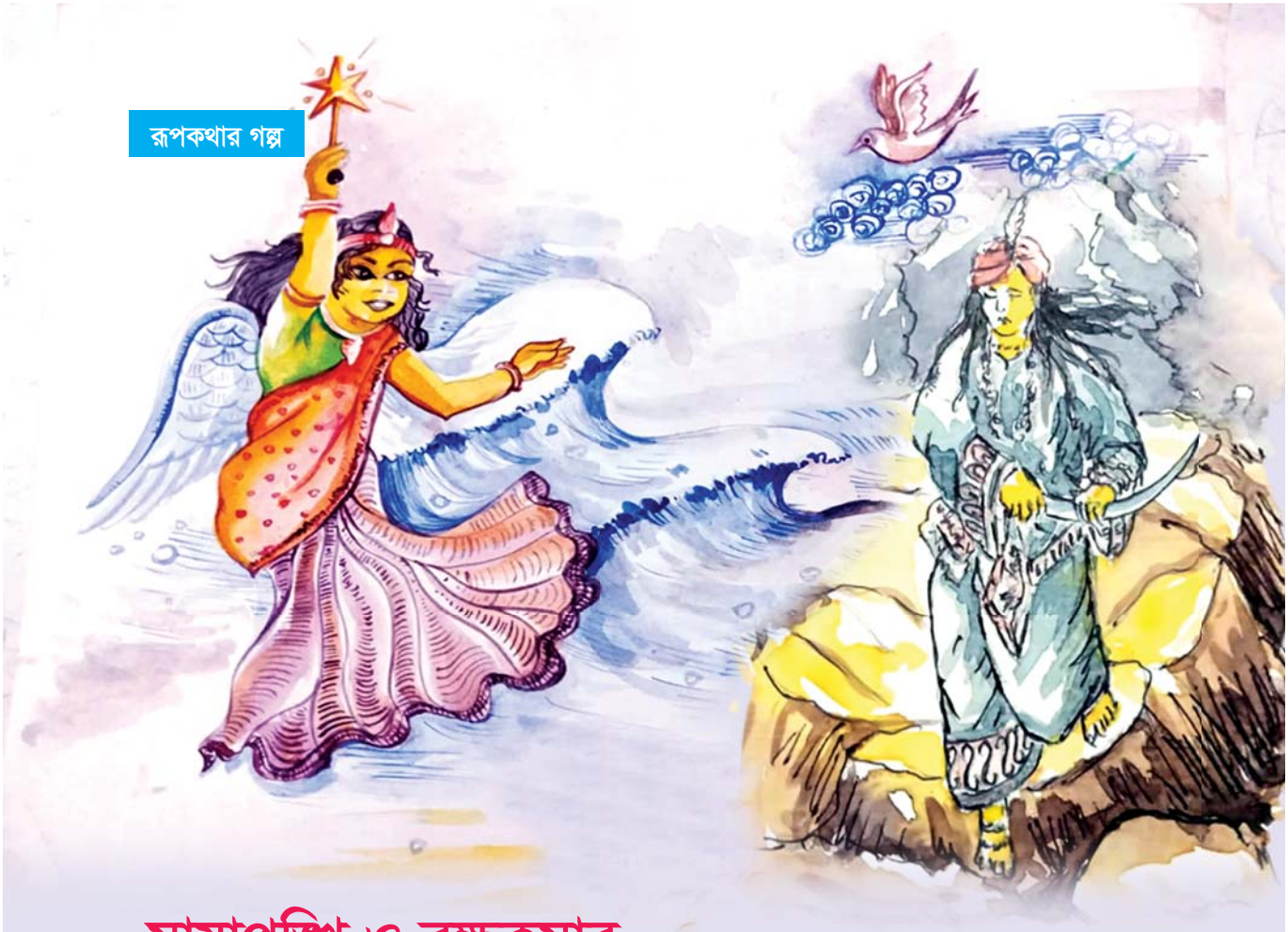

মায়াপঙ্খি ও বৃক্ষকুমার

ইউনুস আহমেদ

এক যে ছিল বিশাল এক বন। বনটা এত বিশাল যে ভিতরে কেউ প্রবেশ করলে আর সহজে বেরুতে পারে না। অনেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। ফুলজোড় নদীর তীরে সেই বন। অনেক রাজকুমারই এখানে অভিযান বা শিকার করতে এসে হারিয়ে যান। সাত পাহাড় পেরিয়ে তার দেশ। চারদিকে শুধু বন আর বন। বনের ঠিক মাঝখানে খুব সুন্দর একটা বৃক্ষ। বেশ নিচু আর ঝাঁকড়াওয়ালা।

সেই বিশাল বনে অদ্ভুত একটা বৃক্ষ আছে। অন্য যত বৃক্ষ আছে তার চেয়ে যেন আলাদা। বৃক্ষটা হাঁটতে পারে। বনের ভেতর একা একা হেঁটে বেড়ায়। বনের পশুপাখিরা নাম দিয়েছে বৃক্ষকুমার। অল্প ডালপালা সেই বৃক্ষকুমারের। মাঝেমধ্যে অনেক দুষ্টু পাখি সেই বৃক্ষকুমারের ডালে বসে থাকে। বৃক্ষকুমারকে গান শোনায়। সবাই বৃক্ষকুমারকে খুব পছন্দ করে। বৃক্ষকুমারের করুণ একটা কাহিনি আছে। সেটা এই বিশাল বনের অনেকেই জানে।

একদিন ঘটল এক ঘটনা। দক্ষিণের বনে ছোট্ট একটা পুকুর। বৃক্ষকুমার হাঁটতে হাঁটতে সেই পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায়ই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পুকুরের টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ পাখা ঝাঁপটানোর শব্দ শুনল বৃক্ষকুমার। দেখল অনিন্দ্য সুন্দর একটা পাখি উড়ে এসে একটা গাছের ডালে বসল। এরকম সুন্দর পাখি বৃক্ষকুমার কখনো দেখেনি। পাখিটা উড়ে গিয়ে নেমে পড়ল পুকুরের কিনারে এবং পানি পান করল। তারপর আবার গিয়ে গাছের ডালে বসল। একটু পর মধুর সুরে গান শুরু করল। বৃক্ষকুমার অবাক! অবিকল মানুষের গলায় গান গাচ্ছে পাখিটা। পাখিটা গান গাচ্ছে। যেন

জীবনের কাহিনি গানের সুরে বলে যাচ্ছে। তাহলে এই পাখিটারও কী তার মতো দুঃখের কোনো কাহিনি আছে? মায়াভরা কণ্ঠে বৃক্ষকুমার কথা বলল।

: তুমি কে গো মায়াপঙ্খি? এত দুঃখের গান গাইছ?

: কে? কে? কে কথা বলল? মায়াপঙ্খিটা এদিক-ওদিক তাকালো।

: আমি বৃক্ষকুমার, এই যে এদিকেই।

: বৃক্ষকুমার? এখানে তো কতই বৃক্ষ, কাকে বৃক্ষকুমার বলব? মায়াপঙ্খি হতাশ কণ্ঠে বলল।

: এই যে আমি দেখো- বলে বৃক্ষকুমার একটু হেঁটে সামনে এল।

: দেখেছি তোমায় বৃক্ষকুমার। কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন? বৃক্ষ হয়ে তুমিও দেখি কথা বলতে পারছ।

: সে অনেক কাহিনি মায়াপঙ্খি, সময় নিয়ে একদিন তোমায় শুনাবো। কিন্তু তোমারও কী একই ঘটনা মায়াপঙ্খি?

: তুমি কিছুটা ধরতে পেরেছ। আমি আসলে মায়ারাজ্যের রাজকন্যা মায়াবতী।

: তাহলে কী করে তুমি পঙ্খি হলে?

: মায়ারাক্ষসের কবলে পড়ে। মায়ারাজ্যের এক প্রান্তে বিশাল এক মায়াবন। সেই মায়াবনে বাস করত সব মায়ারাক্ষস। একদিন মায়ারাক্ষসরা সব হামলে পড়ল মায়ারাজ্যে। কেউ কেউ পালিয়ে গেল। বাকি সবাইকে বন্দি করা হলো। জাদু দিয়ে আমাকে পাখি বানিয়ে দিলো। আমি হলাম গিয়ে মায়াপঙ্খি। সেই থেকে আমি বনে বনে ঘুরে বেড়াই। আর গান গাই।

: অনেক করুণ কাহিনি, মায়াপঙ্খি।

: ঠিক বলেছ, আমি সব সময় আমার পিতা, মাতা আর রাজ্যের সবাইকে খুঁজে বেড়াই। আচ্ছা, তোমারও কি একই ঘটনা, বৃক্ষকুমার?

: আমার ঘটনা? আচ্ছা তাহলে শোনো। এই বিশাল বনে এসেছিলাম ঘুরতে আর শিকার করতে। হঠাৎ একদিন ডাইনির কবলে পড়ে যাই। ডাইনি তার জাদু দিয়ে আমাকে বৃক্ষ বানিয়ে দেয়। সেই থেকে বনের সবাই আমাকে বৃক্ষকুমার নামে ডাকে।

: তোমাকে খুঁজতে আসেনি কেউ, বৃক্ষকুমার?

: এসেছিল আমার রাজ্য থেকে কিন্তু একটা বৃক্ষকে কথা বলতে দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। তারপর আর কেউ আসেনি। তারা আমাকে চিনতেই পারেনি।

: খুব দুঃখের কাহিনি বৃক্ষকুমার। আমি কি তোমাকে সান্ত্বনা দিতে তোমার ডালের ওপর বসতে পারি?

: নিশ্চয়ই, এ পর্যন্ত আমার ডালের ওপর কোনো পাখি বসেনি। তুমি বসলে অনেক খুশি হবো আমি।

: ঠিক আছে, বৃক্ষকুমার- বলে মায়াপঙ্খি উড়াল দিয়ে বৃক্ষকুমারের ডালে গিয়ে বসল। আর অমনি ঘটল আশ্চর্য ঘটনা! মায়াপঙ্খি বৃক্ষকুমারের ডালে গিয়ে বসতেই পাখি থেকে হয়ে গেল মানুষ। রাজকন্যা মায়াবতী! আরো আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যখন মায়াবতী লাফ দিয়ে নিচে নামল। বৃক্ষকুমারও বৃক্ষ থেকে হয়ে গেল মানুষ মানে রাজপুত্র সুবর্ণ কুমার।

মায়াপঙ্খি আর বৃক্ষকুমার তাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষে পরিণত হলো। পুরো বনে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। পাখিরা কিচিরমিচির করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। গাছপালাগুলি তাদের ডালপালা আর পাতা নাড়িয়ে অভিবাদন জানালো। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মায়াবতী আর সুবর্ণকুমার বনের বাইরে এসে একটা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখল আকাশ কালো করে বিশাল এক পাখি ডানা মেলে পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে। পাখিটাকে দেখে মায়াবতী হেসে উঠল। তারপর জোরে শিস বাজালো। মায়াবতী বলল, আমার বন্ধু আকাশ পাখি। ওর পিঠে চড়েই পৌঁছে যাব মায়ারাজ্যে। মায়াবতী শিস শুনতে পেয়ে আকাশ পাখি এসে পাহাড়ে নামল। তারপর রাজকন্যা মায়াবতী আর বৃক্ষকুমার মানে সুবর্ণ কুমার সেই আকাশপাখির পিঠে চড়ে রওনা দিলো মায়ারাজ্যের দিকে। মায়ারাজ্যে পৌঁছে দেখল রাজ্যের মায়াজাদু কেটে গেছে। সবাই ফিরে এসেছে। তারপর মায়ারাজ্যের রাজা সুবর্ণকুমারের রাজ্য সুন্দর দ্বীপে খবর পাঠিয়ে দিলো। তারা আসার পর ধুমধাম করে মায়াবতী আর বৃক্ষকুমারের বিয়ে হয়ে গেল। এরপর থেকে সবাই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। ❑

গল্পকার

বিজয় এল

রকিবুল ইসলাম

বিজয় এল সবুজ লালে
ঊষার আলোয় প্রভাতকালে।
বিজয় এলে মুক্ত আকাশ
আসমানি রং মাখে
ছেলের শোকে আর দেখি না
কাঁদতে আমার মাকে।
বিজয় এল ধানের ক্ষেতে
হলুদ আভা মেখে
দোয়েল শ্যামা মায়ের কাছে
মাতৃভাষা শেখে।
বিজয় এল নায়ের পালে
নদীর কলতানে
ছোট্ট খুকু শোলক বলে
পাখির গানে গানে।

বিজয় এল সবুজ লালে
সবুজ পাতার ডালে ডালে।

বিজয়ের সুখ

আতিক রহমান

স্বাধীনতা ওই বিশাল আকাশে নীলের খাতায় আঁকা
স্বাধীনতা ওই স্বপ্নের নদী বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা!
আমি তো স্বাধীন তাই তো স্বাধীন ভাবনার ছবি আঁকি
আমার দুচোখে সবুজে-সবুজে স্বপ্নের মাখামাখি।
স্বপ্ন আমার স্বপ্নের মতো স্বাধীন হাওয়ায় ভাসে
ভোরের সোনালি রোদের খেলায় আমার স্বপ্ন হাসে!
আঁধার রাতের জ্যোৎস্নার ফুল-তারাদের ঝিলিমিলি
আমার মনের রঙিন আবেগে কেটে যায় তারা বিলি।
আমার স্বপ্ন লাল ইতিহাসে সবুজ বর্ণমালা.....
আমার স্বপ্ন মায়ের অশ্রু, বোনের বুকের জ্বালা
আমার স্বপ্ন সফলতা পেল লাখো বীরদের প্রাণে
একটি সাগর রক্ত আমার স্বপ্নকে বয়ে আনে।
শেখ মুজিবের দীপ্ত ভাষণে আমার স্বপ্ন বোনা...
আমার স্বপ্ন প্রিয় স্বাধীনতা মুক্ত- মানিক - সোনা।
যুদ্ধে-যুদ্ধে নয় মাস শেষে উঠল নতুন রবি-
সেই সে স্বাধীন সূর্যে হাসল আমার দেশের ছবি!
অধীনতা থেকে স্বাধীন হলাম এমনি করেই আমি;
বিজয়ের সুখে এদেশ আমার প্রাণের চেয়েও দামি।

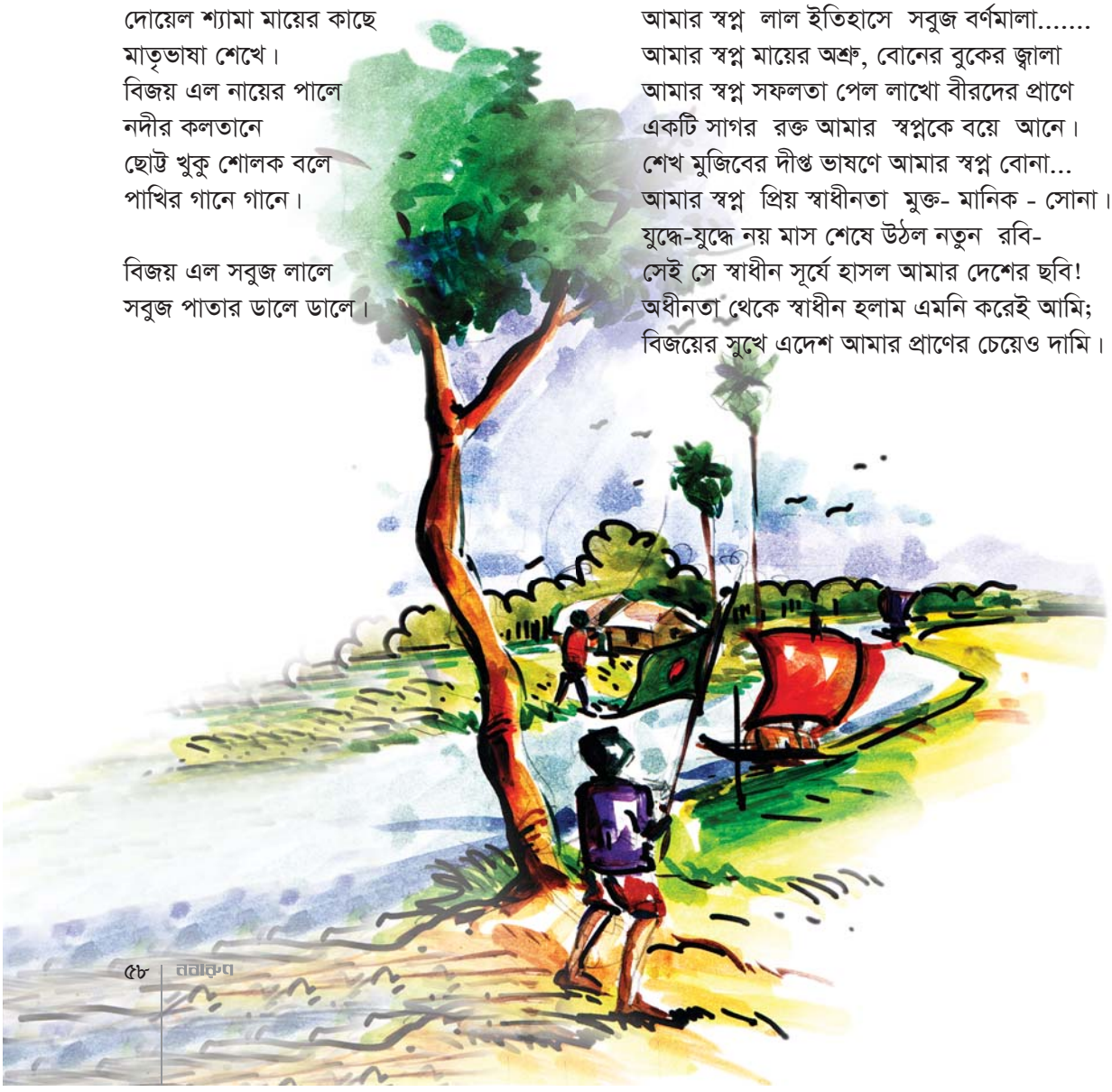

গল্প

মন্টু মামার বাঘ শিকার

জাফর তালুকদার

[শেষ পর্ব]

সকালটা পাতলা রং ধরেছে সামান্য। হালকা বাতাসে ঝির ঝির গুঞ্জন উঠছে গাছের পাতায়।

একটা পাখি ক ক করে উড়ে গেল মাথার ওপর।

একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক ভেসে আসছিল তখনও।

হঠাৎ বনবাদাড় কেঁপে ভেসে এল বাঘের গর্জন। গাছটা অস্বাভাবিক দুলে উঠল। এটা কী রাতের সেই বাঘটা?

তারা এসেছে টের পায়নি তো?

বাঘ নাকি খুব চালাক। নাক শুঁকে মানুষের গন্ধ টের পায়। ওটা কী মানুষখেকো নাকি? তাহলে তো আরো মুশকিল। নাক টেনে টেনে ঠিকই পৌঁছে যাবে গাছের নিচে।

বাঘটা কী চিড়িয়াখানায় দেখা বাঘের মতো অত বড়ো হবে! খুলনায় এসপি সাহেবের চিড়িয়াখানায় একটা ভয়ংকর বাঘ ছিল। স্কুলের টিফিনের সময় দলবেঁধে দেখতে যেত ছেলেরা।

বড়ো একটা খাঁচার ভেতর ওটা শুয়ে-বসে ঝিমাত। ওর জন্য খেতে দেওয়া হতো জ্যান্ত একটা কুকুর।

সে ভারি কষ্টের দৃশ্য।

ভয়ে এককোণে বসে কুইকুই করে কাঁদত কুকুরটা। আড়চোখে বাঘটাকে দেখত আর কাঁপত থরথর করে।

বাঘটা আগুন আগুন চোখে তাকিয়ে জিভ নাড়ত ভয়ংকর ভঙ্গিতে। এভাবে একটু একটু করে সে নিজেকে তৈরি করত চূড়ান্ত আক্রমণের। অনেকটা যেন আলো জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মতো।

এই দেখে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসত ছেলেরা।

যদি এমন একটা বাঘ সত্যি সত্যি আসে কী করবে সে? মতিকাকুকে ডাকবে? নাকি ওই শিকারি লোকটাকে!

রাতে তো কত গল্প শোনাল। এসব বিড়ালকে সে থোরাই ডরায়। আসুক না একটা। চোখ গলিয়ে দেবে আঙুল দিয়ে।

বলে কী মানুষটা! এত দেখি আরেক পচাব্দী গাজী?

কাজ নেই বাপু কাউকে ডেকে। যা থাকে কপালে তাতো হবেই।

অদ্ভুত নিঝুম চারদিকটা। একটা পাতা পড়লেও চমকে উঠছে।

নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

মহা মুশকিল হলো বন্দুকটা এমন করে কাঁপছে কেন?

হাত খসে পড়ে যাবে না তো?

বাঘটা যদি এসেই বসে কী হবে তাহলে? কী আর হবে!

কপাল বরাবর গুলি চালিয়ে দেব।

পিন্টুর ক্যামেরাটা আনলে বেশ হতো। ওর বিলু মামা একটা ডায়না ক্যামেরা এনে দিয়েছে ঢাকা থেকে।

গুলিতে মারা বাঘটার কাছে দাঁড়িয়ে ছবিটা নিতে পারলে মন্দ হতো না।

মেহের আলীরা বহু পুরস্কার পেয়েছে বাঘ শিকার করে।

ফরেস্টার সাহেব নিশ্চয় খুব অবাক হবেন। চোখ কপালে তুলে বলবেন, তাহলে তুমিই মানুষখেকোটার দফা রফা করতে পারলে? কী কাণ্ড বলতো! তোমাকে তো মোটা পুরস্কার না দিয়ে উপায় নেই।

বাড়ি ফিরলে না জানি কী ঘটে যায়!

বাবার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে নিশ্চয়।

কী কাণ্ড করেছিসরে পাগলা! তোর কুঁজো বক মারা হাতের এমন দুর্দান্ত টিপ? হ্যাঁ, দেখতে হবে তো কার ছেলে!

পাড়ার লোকজন ছুটে আসবে চোখ বড়ো বড়ো করে। নীলু ভাই হাসতে হাসতে বলবেন, তোকে আমাদের পল্লিমঙ্গল থেকে একটা সংবর্ধনা দেবো। ভীরু মানুষের অনেক কিছু শেখার আছে তোর কাছে।

ওরে বীর আধমরাকে ঘা মেরে তুই বাঁচা।

কিসের শব্দ?

মচ,মচ,মচ,মচ.....

মতিকাকুর সাড়া নেই কেন?

শিকারি লোকটা কী করছে!

একটা বানর কিচকিচ করে উঠল।

বাঘ আসছে না তো?

একি হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে কেন?

মচ মচ মচ মচ মচ মচমচ...

শব্দটা এখন আরো কাছে।

বন্দুকের নলটা এরকম অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে কেন? মনে হয় হাত পিছলে ওটা এখনই পড়ে যাবে মাটিতে।

খোকা কথার মাঝে ফুড়ন কাটল, তারপর কী হলো মামা! বাঘ শিকার করলে?

এই হলো তোদের দোষ। কথার মাঝে হুট করে বাম হাত ঢোকানো।

দিলি তো মুডটা নষ্ট করে। অমন একটা এক্সাইটেড মুহূর্ত!

হাওয়েভার, কী যেন বলছিলাম...।

স্যরি মামা, ভুল হয়ে গেছে। যা বলছিলে তুমি বলো।

মামা রেগে গেলে পুটুস পুটুস ইংরেজি বের হয়।

নো মেনশান। তো বাঘটা আসছে...। আসুক। কে পরোয়া করছে! আমি কী তোর ওই পুতু পুতু জিম করবেট নাকি! উনি একটা রোগা চিতা মেরে কত বাহানা। আর আমার সামনে এখন মচ মচ করে

আসছেন দ্য গ্রেট রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

মতিকাকু বিশেষ সংকেত দিলেন।

অর্থাৎ উনি আসছেন। সাবধান...।

সর্বনাশ বন্দুকের নলের সঙ্গে হাত-পা সমান তালে কাঁপছে। প্যান্টের সামনের অংশটা কখন ভিজে গেছে টের পায়নি। মাথাটা এমন করে গুলিয়ে উঠছে কেন? চোখটোখ মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরল নৌকায় এসে।

মতিকাকু মানুষটা রসিক। শরীর দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুই একটা রেকর্ড করলিরে মন্টা। গুইসাপের পায়ের শব্দেই গাছ থেকে উল্টে পড়লি। সত্যি সত্যি বাঘ এলে তো খুঁজেই পাওয়া যেত না। বন্দুক ভেঙেছে ভাঙুক। ভাগ্যিস গুলিটা ফোটেনি।

এই হলো আমার বাঘ শিকারের কাহিনি। কিরে বুঝলি কিছু!

মামার শিকার কাহিনিতে বোঝাবুঝির কিছু নেই। কিন্তু সুন্দরবনের রেস্টহাউসে শুয়ে শুয়ে কেন যেন ঘটনাটা মনে পড়ল।

চাঁদ উঠে গেছে।

খোলা জানালা বেয়ে গলগলে আলো নেমে ভরে গেছে ঘরখানা।

ঘুম আসছে না।

শির শির বাতাস বইছে। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা ভর করে আছে চারদিকে। মাঝে মাঝে মাঝে বিচিত্র গলায় ডেকে উঠছে দু'একটা রাতজাগা পাখি। কোথায় যেন মৃদু হল্লা উঠে থেমে গেল আবার।

সকাল হলেই সবাই শিকারে যাবেন। মা আর তুলু যাবে না। তারা থাকবে লঞ্চে।

বাবা আছেন লোকলশকর নিয়ে। সবাই তাকে খুশি করতে ব্যস্ত। তাকে নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

খোকা তুমিও যাবে।

কোথায় বাবা?

কেন শিকারে!

আমি তো শিকার করতে পারি না!

শুরুতে সবাই পারে না। শিখে নিতে হয়। তুমিও পারবে।

না বাবা, আমি পারব না।

কেন পারবে না?

ভয় করে।

ভয় করলে ভয়। ভয় না করলে কিসের ভয়...!

তবুও..।

এটা কোনো কাজের কথা নয়। তুমি না জিম করবেটের ভক্ত?

আমি যাবো না। তোমরা যাও বাবা।

তাহলে এলে কেন?

দেখতে।

এখানে দেখার কী আছে! সাপখোপ, বাঘভাল্লুক দেখতে কেউ জঙ্গলে আসে নাকি?

তাহলে কেন আসে?

আসে ওসব মারতে।

বাবা কথা না বাড়িয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে বসলেন।

রাত কত হলো কে জানে। চাঁদ সরে গেছে আর একটু। বাতাস থেমে গেছে। কেমন একটা হাহাকারের গুমোট নেমে এল চারদিকে।

খোকা।

কে?

ভয় পেলে নাকি! আঁধার বলে আমাকে দেখতে পাচ্ছো না। একটু সরে এসে তাকাও। কী চিনতে পেরেছ!

ওরে বাবা, বাঘ, বাঘ..!

আহা, চেঁচিও না। লোকজন টের পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তুমি এখানে এসেছ কেন?

তোমাকে দেখতে।

আমাকে দেখার কী আছে!

আছে বলেই তো এসেছি। তুমি সবার মতো নও। একদম অন্য রকম।

তুমি দয়া করে এখন যাও। বাবা টের পেলে...!

হ্যাঁ যাব। তবে তুমিও চলো আমার সঙ্গে। ভয় নেই। পিঠে বসিয়ে নিয়ে যাবো।

না বাপু, তুমি যাও। তোমার মতলব সুবিধার মনে হচ্ছে না।

কেন, কী মনে হচ্ছে?

আমাকে নিয়ে খেয়ে ফেলবে এই আর কি!

তোমার তাই মনে হলো!

তাছাড়া কী।

ভারি আফসোস। সবাই আমাদের যা ভাবে তুমিও তাই..।

তাহলে এত রাতে লুকিয়ে এসেছ কেন? ওই যে বললাম তোমাকে নিয়ে যেতে।

কোথায় নেবে আমাকে?

কোথায় আর নেবো! এসেছ যখন একটু ঘুরে ফিরে দেখে যাও আমরা কেমন আছি।

কেন, শুনেছি তো রাজার হালেই আছো। ইচ্ছেমতো লোকজন ধরে খাচ্ছো কচকচ করে।

তাই বুঝি। আমরাই শুধু মানুষ ধরে খাই। মানুষ আমাদের খায় না?

তা কথাটা মন্দ বলোনি। কিন্তু গরিব বাওয়ালি আর জেলে-মউয়ালদের খেলে পুরো পরিবারটাই যে ধসে যায়।

দেখ, আগে সুন্দরবনে যে হরিণ,বাঘ,ভালুক, আর গণ্ডার ছিল, এখন ক'টা আছে?

নেই কেন?

সেটা তোমরাই ভালো জানো।

গণ্ডার তো আফ্রিকার জঙ্গলে থাকে। সুন্দরবনেও ছিল নাকি!

তবে কী মিথ্যা বলেছি! একদিন শুনবে বাঘও নাই হয়ে গেছে।

কেন, তা হবে কেন? তোমরা তো দিব্যি আছ রাজার হালে। ভয়ে কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না কেউ।

সেটা অন্য কথা। কিন্ত রাজার হালে আছি এটা কী করে বুঝলে! আমরা বেঁচে আছি না মরে আছি তা কী ফিরে তাকায় কেউ।

সেকি তোমাদের আবার বাঁচামরা কী! কিসের অভাব শুনি?

এটা তোমরা কখনো শুনতে চাওনি। এখন আর বলে কী হবে!

রাগ করেছ মনে হচ্ছে।

না, না, তোমার ওপর রাগ করলে তো এখানে আসতাম না। আমরা তোমাদের সুন্দরবনকে পাহারা দিয়ে রাখছি। একদিন হয়ত গণ্ডারের মতো আমরাও থাকব না। মনে রেখ, সেদিন তোমার সুন্দরবনও থাকবে না। সব লুটপাট হয়ে চলে যাবে মানুষের পেটে।

চাঁদের ওপর হালকা মেঘের ছায়া এসে পড়ল।

সেই আলো আলো ভাবটা মরে গেছে। কোথায় যেন একটা হল্লা উঠল।

একটা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল নদীর দিকে। ওদিকটা কেমন অন্ধকারে ঢাকা। শুধু বিন্দুর মতো একটা আলোর ফুটকি জ্বলে উঠে নিভে গেল আবার।

জঙ্গলটা এখন আর চেনা যায় না। ছায়াভূতের মতো কেমন থির হয়ে রয়েছে। কেন যেন মনে হয় ওটা চুপিচুপি এগিয়ে আসছে এদিকে।

বাবার কাশি শোনা গেল। সর্বনাশ, বাবা এদিকে আসছেন নাকি!

তুমি এখন যাও। আমি ঘুমাবো।

কেন, আমার সঙ্গে যাবে না? ভয় পেও না। তোমাকে আমি পিঠে বয়ে নিয়ে যাব, আবার নিয়ে আসব। কেউ টের পাবে না।

কী সর্বনাশ! বাঘ-ভালুককে বিশ্বাস করতে আছে!

সেটা ঠিক বলেছ। তবে শুধু আমাদের দুষে লাভ নেই। এই বিশ্বাসটাই আসলে নষ্ট হয়ে গেছে সবার। সে পশু বলো আর মানুষ বলো।

তুমি এখন যাও। বাবা দেখতে পেলে খুব খারাপ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। কিন্তু একটা কষ্ট রয়ে গেল মনে। সবাইকে বলে এসেছি তোমার যাবার কথা। তুমি গেলে কত খুশি হতো ওরা।

কেন খুশি হতো?

তুমি তো অন্য রকম। সবাই আমাদের ভয় পায়। ঘৃণা করে। গুলি করে মারে। অথচ আমরাই কিন্তু অষ্টপ্রহর পাহারা দিয়ে রাখছি জঙ্গলটা! তুমি এটা বুঝলেও আর তো কেউ এটা কানে তোলে না।

আমাকে তুমি কী করে চিনলে?

চেনাটাই তো আমাদের শক্তি। তোমরা যেমন বন্দুক দিয়ে চেন, আমরা চিনি মন দিয়ে। ঘ্রাণ শুঁকে বলতে পারি কে কী চায়!

কথা তো বেশ ভালোই শিখেছ দেখছি। তা তুমি থাকো কোনখানে?

সুন্দরবনের কতটুকু চেন তুমি! ওই যে শেখের খাল, ওখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে ভাঙাচোরা কালিবাড়ি, লবণ ঘর, দুর্গ,ইমারত। ওখানেই বাসা বানিয়ে আমরা থাকি। ভাবতে পারো, জঙ্গলের মধ্যে ঘরবাড়ি! একসময় কোনো জমিদার হয়ত থেকেছেন এখানে? কোথায় গেল ওনার দাপট! তার নামটা পর্যন্ত তোমরা জানো না কেউ! বুঝলে আমরাই এখন ভাঙাবাড়ির জমিদার। হা, হা, হা...।

জমিদার কেন, তোমরা তো বনের রাজা। বেশ হলোতো। এবার তুমি যাও।

বাবার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল।

কিরে খোকা, কত বেলা হলো খেয়াল আছে! আর কত ঘুমোবি? তোকে বলেছি না শোবার আগে জানালা বন্ধ করে দিবি। কী সর্বনাশ, রাতে বাঘ ঢুকেছিল রেস্টহাউসের কম্পাউন্ডে। তাজা পায়ের ছাপ পড়ে আছে। ওটা মনে হয় ম্যানইটার হবে। হাওয়েভার, লোকজনকে খবর দেয়া হয়েছে। ওটা নির্ঘাত আবার আসবে। রাতে ছাগলের টোপ দিয়ে বন্দুকের কলপাতা হবে। তোমরা বাইরে যেও না। আজকের শিকারের প্রোগ্রাম ক্যানসেল...।

বাবা গুরুত্বপূর্ণ লোক। বাঘ নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে।

গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে এতবড়ো ঘটনা কী করে ঘটল!

এটাতো রীতিমতো দায়িত্বহীনতার সামিল। চাকরি চলে যাবে। বেচারা!

রাতে বড়ো চাঁদ উঠল। চারদিকটা ঝকমক করছে আশ্চর্য রকম।

বাতাস এখন বন্ধ। কেমন ধোঁয়াটে গুমোটে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বারান্দায় চাপা গলায় কাকে যেন ধমক দিলেন বাবা।

খোকা অস্থির পায়ে লাফিয়ে উঠে খুলে দিল বন্ধ জানালাটা।

আলো আসুক। ❑

গল্পকার

রাতারগুলে একদিন ॥ মোহাম্মদ মামুন হোসেন

চারদিকে নির্জনতা, কানে পৌঁছায় শুধু নৌকার বৈঠার শব্দ। প্রকৃতি তার মায়াবী রূপের সবটাই যেন ঢেলে দিয়েছে এখানে, সেই রূপে বিমোহিত হয়ে এগিয়ে যাওয়া সবুজের বনে। বলছি সিলেটে অবস্থিত দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক পর্যটনস্থল রাতারগুলের কথা।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আওতায় আমরা ৩৭ জনের একটি দল গিয়েছিলাম সিলেটে। গত ৯ই অক্টোবর রাত ১০.৩০ মিনিটে ফকিরাপুল বাসস্ট্যান্ড থেকে রিজার্ভ বাসে রওনা দেই সিলেটের পর্যটন মোটেলের উদ্দেশ্যে। ১০ই অক্টোবর সকাল ৭.৩০ মিনিটে আমরা মোটেলে পৌঁছে যাই। সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৯০ ফুট উঁচুতে নান্দনিক সৌন্দর্যে ঘেরা পর্যটন মোটেলটি বেশ ভালোই লেগেছে সবার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মোটেলে নাশতা সেরে সকাল ১০.৩০ মিনিটে আমাদের রিজার্ভ করা ৪টি মাইক্রোবাসে করে রওনা দিলাম 'বাংলার অ্যামাজন' নামে পরিচিত 'রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট'-এর উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীর মাত্র ২২টি মিঠাপানির জলাবনের মধ্যে একটা আছে আমাদের দেশে, এই তথ্যটা জানার পর অনেকটা আগ্রহ নিয়েই রাতারগুলে আসা। রাতারগুল মূলত 'ফ্রেশওয়াটার সোয়াম্প ফরেস্ট' বা জলাবন। এমন বন বাংলাদেশে আর কোথাও দেখা যায় না। সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলা গোয়াইনঘাটের ফতেহপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। বনের দূরত্ব সিলেট শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার। আয়তন ৩,৩২৫.৬১ একর, আর এর মধ্যে ৫০৪ একর অঞ্চলকে ১৯৭৩ সালে বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

রাতারগুলে পৌঁছানোর পর মাইক্রোবাস থামিয়ে ৮টি নৌকা ভাড়া করা হলো। ভাড়া করা স্থান থেকে নৌকাঘাট যেতে আধা কিলোমিটারের মতো পথ হাঁটতে হয়। গ্রাম্য পথ আর প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে হেঁটে যেতে ভালোই লেগেছিল। এরপর নির্ধারিত নৌকায় আমরা উঠলাম। একটি নৌকায় ৪-৫ জন বসলাম।

এরপর শুরু হলো নৌকাভ্রমণ। পুরো এলাকা জুড়ে ঘন জঙ্গল, অথচ পুরোটাই পানিতে ভাসমান। অচেনা অজানা নানা প্রজাতির গাছগুলো যেন পানির নিচ থেকে মাথা উঁচু করে আমাদেরকেই দেখছে। শুরুতে বেশ খানিকটা পথ বড়ো বিলের মতো (এটি চেঙ্গের খাল

নামে পরিচিত) উপরে খোলা আকাশ। খোলা আকাশ আর প্রশস্ত বিল পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম গাছের অরণ্যে। গাছগাছালির ঘন নির্জনতায় আকাশটা হারায় মাঝে মাঝেই। রাতারগুল প্রাকৃতিক বন হলেও বন বিভাগের উদ্যোগে এখানে হিজল, বরুণ, করচ আর মুর্তাসহ বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। এছাড়াও রাতারগুলের কদম, জালিবেত, অর্জুনসহ পানিসহিষ্ণু প্রায় ৭৩ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।

রাতারগুলে রাতাগাছ (বৈজ্ঞানিক নাম- Schumannianthus dichotomus) নামে এক ধরনের উদ্ভিদের দেখা মেলে। স্থানীয় ভাষায় এটি মুর্তা নামে পরিচিত। এ গাছের নামানুসারে এই বনের নাম হয়েছে রাতারগুল। তাছাড়া রাতারগুলে সবচেয়ে বেশি জন্মায় করচ গাছ।

রাতারগুলে বছরে দু'রকম রূপের দেখা মেলে। বছরের একটা সময় এ বনের গাছগাছালির বেশিরভাগ অংশই পানির নিচে থাকে। সেসময় এই বন ২০-৩০ ফুট পানির নিচে ডুবে থাকে। বর্ষা মৌসুম শেষে বনের পানি কমে যায়। পানির উচ্চতা তখন ১০ ফুটের মতো থাকে। স্থানীয় লোকদের ভাষ্যমতে, আমরা রাতারগুলে যাওয়ার ২ দিন আগেও নাকি পানি কম ছিল, কিন্তু ভাগ্য আমাদেরকে ভরা মৌসুমের রূপ দেখার সুযোগ দিয়েছিল। আমরা সিলেট যাওয়ার একদিন আগে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পানির পরিমাণ বেশি ছিল গাছগাছালির অনেকটা অংশই ছিল পানির নিচে। সোয়াম্প ফরেস্ট দেখার সৌন্দর্য এখানেই।

যত বনের গভীরে যাচ্ছিলাম মাঝির কণ্ঠে গান আর আমাদের হৈ-হুল্লোড়ে নীরব বনও সরব হয়ে গিয়েছিল। এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় পানি ছিটানো, বনের ফাঁকে ফাঁকে গাছের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তোলা, গল্প আর হাসাহাসিতেই মশগুল ছিল সবাই। নেই কোনো ক্লান্তির ছাপ, মনে হচ্ছিল সবাই যেন তার শৈশবে ফিরে গিয়েছে।

বনের ভেতর দিয়ে যত এগিয়ে যেতে থাকি, নির্জনতা যেন ততই গ্রাস করে। এ নীরবতার মাঝেই পাখিদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে রাতারগুলের গাছপালা। পাখি আর পতঙ্গের ভিড়ের মাঝে হুটহাট চোখে পড়ল বানর। এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে বেড়ানো শাখামৃগগুলো পর্যটক দেখলেই ভেভচি কাটছিল। কখনো সুযোগ পেলে পর্যটকদের নৌকায়ও চড়ে বসে তারা।

রাতারগুলের পানি ছিল বেশ ঠান্ডা এবং অনেকটাই স্বচ্ছ। কিছুক্ষণ পরপর পানিতে হাত দেওয়ার অনুভবটা এখনও শিহরিত করে। ঝোপের মধ্য থেকে গাছের ডালের নিচ নিয়ে নৌকা যখন যাচ্ছিল– মনে হচ্ছিল আমরা কোনো সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকছি। যতই ভেতর যাচ্ছিলাম ততই মুগ্ধ হচ্ছিলাম। আঁকাবাঁকা গাছের ফাঁকে ফাঁকে নৌকা নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা–অ্যামাজন জঙ্গলের অনুভূতি দিচ্চিল।

রাতারগুলে আছে ১৭৫ প্রজাতির পাখি। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাছরাঙা, বিভিন্ন প্রজাতির বক, ঘুঘু, ফিঙে, বালিহাঁস, টিয়া, বুলবুলি, পানকৌড়ি, ঢুপি, চিল এবং বাজপাখি ইত্যাদি। শীতকালে অতিথি পাখিরও আনাগোনা থাকে এ বনে। তবে সারা বছরই খুব বেশি পরিমাণে ফড়িং চোখে পড়ে।

পানির রাজত্ব আছে বলে এই বনে সাপের আবাস বেশি, আছে জোঁকও। আমার সহকর্মীদের একটি নৌকাতে তো ছোটো একটি সাপ উঠে যায়। নিজ হাতে তা অপসারণ করে ভালোই সাহস দেখিয়েছিল সহকর্মী এস. এম. মাছুদ। রাতারগুলে উভচর প্রাণী আছে ৯ প্রজাতির। সরীসৃপ রয়েছে ২০ প্রজাতির। আরো আছে ২৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী।

মাঝির কণ্ঠে গান শোনা, বনের পানি স্পর্শ করা, এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় পানি ছিটানো– এসব করতে করতে কখন যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল বুঝতেই পারছিলাম না। আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যখন বের হচ্ছিলাম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ততক্ষণে প্রায় ২ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সত্যি অসাধারণ ছিল আমাদের এই ট্যুরটি। ❑

সম্পাদকীয় সহযোগী, অ্যাডহক প্রকাশনা, ডিএফপি

বিজয়ের মাসে বিরল সম্মান

সাব্বির আহমেদ

ঢাকার রিকশা ও রিকশাচিত্রের নান্দনিক উপস্থাপনা বহু বছর ধরে সৌন্দর্য পিপাসুদের মনের খোরাক জোগাচ্ছে। রিকশা সারা বাংলাদেশে পাওয়া গেলেও ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে এই বাহনটির বিশেষ সম্পর্ক আছে। বর্তমানে আমরা যে রঙিন রিকশা দেখি, তার সূত্রপাত হয়েছিল মূলত যাত্রী আকর্ষণের উপায় হিসেবে। রিকশার সাথে সাথে বডিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের তুলির আঁচড়ে আঁকা রিকশাচিত্রও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে। এক পর্যায়ে রিকশাচিত্র ছাড়া রিকশা কল্পনা করাই যেন দুরূহ হয়ে পড়ে। সময়ের পরিক্রমায় রিকশাচিত্র আমাদের দেশীয় শিল্প ও ঐতিহ্যের অংশ হয়ে যায়। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ এর সুনাম আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। তারই অংশ হিসেবে এবার এল ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ঢাকা শহরের 'রিকশা ও রিকশাচিত্র'। বিজয়ের মাসে বিরল অর্জন। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সম্মান ও প্রাপ্তি। ৬ ই নভেম্বর বুধবার ইউনেস্কোর বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তঃসরকার কমিটির ১৮তম অধিবেশনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে রিকশা ও রিকশাচিত্র বৈশ্বিক বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেল।

আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার কাসান শহরে ৪ঠা নভেম্বর সোমবার শুরু হয় ইউনেসকোর আন্তঃসরকার কমিটির অধিবেশন। প্রায় তিন ঘণ্টার অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিমূর্ত ঐতিহ্য। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থাপন করা হয় তাঁদের নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্য। এতে বাংলাদেশের রিকশা ও রিকশাশিল্প নিয়ে তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। তাতে বলা হয়, ঢাকা শহরের তিন চাকার এই বাহনে থাকে নানা রঙের বৈচিত্র্য। বাহন হিসেবে শহরের মানুষের প্রথম পছন্দের তালিকায় রয়েছে রিকশা। একই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, রিকশাচিত্র শুধু একটি শিল্প নয়, এটি মানুষের সমকালীন জীবনের গল্প বলার চলমান ক্যানভাস। রিকশাচিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃতি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের মধ্যে চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের মুখচ্ছবিও উঠে আসে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার মুহম্মদ তালহা ও দূতাবাসের প্রথম সচিব ওয়ালিদ বিন কাশেম। ইউনেস্কোর নিয়ম অনুযায়ী, রাষ্ট্রপক্ষ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হয়ে বাংলা একাডেমি রিকশা ও রিকশাচিত্রের বিষয়টি পাঠিয়ে দেয়। তবে এর কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। ২০১৮

সালের ইউনেস্কোর আন্তঃসরকার কমিটির ১৩তম অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তথ্য হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে এ-সংক্রান্ত ফাইলটি ফিরিয়ে আনা হয়। নানা পর্যায়ে সংশোধনের পর সেটি স্বীকৃতির জন্য আবার পাঠানো হয়। ২০২২ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় নথি নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। অপেক্ষার ছয় বছর পর বাংলাদেশের জন্য বয়ে এল এই সম্মান।

বাংলাদেশের বাউলগান (২০০৮), জামদানি বুননশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও শীতলপাটি বুননশিল্পের (২০১৭) পর পঞ্চম বিমূর্ত ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর 'ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি' তালিকায় স্থান পেল রিকশা ও রিকশাচিত্র।

রিকশাচিত্রের ইতিহাস

ইতিহাসবিদরা বলেন, ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের আগে ঢাকায় রিকশা ও রিকশাচিত্রের প্রচলন হয়। বিষয়বস্তু ও চিত্রের ধরন বিবেচনায় নিলে সে সময়কার সিনেমার পোস্টারের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। ১৯৪১ এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকা শহরে রিকশার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৭ এবং ১৮১। (সূত্র: বাংলাপিডিয়া)।

রিকশার জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে রিকশাচিত্রের জনপ্রিয়তাও। মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের হাতেই এই শিল্পের হাতেখড়ি। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় গণহত্যা ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীরদের ছবি রিকশাচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। সত্তরের দশকে মাঝামাঝিতে এসে সিনেমার তারকা ও সাধারণ মানুষের ছবি রিকশাচিত্রে স্থান পেতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় রিকশার গায়ে কাল্পনিক প্রাণীর ছবিও আঁকতে শুরু করেন চিত্রশিল্পীরা। এটি ছিল রিকশাচিত্রের জন্য এক উল্লেখযোগ্য মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। আশির দশকের শুরুতে সিনেমার তারকারা আবারও রিকশাচিত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেতে শুরু করেন। তারকাদের সানগ্লাস পরা ছবি, আইকনিক চুল, লাল টকটকে গাল এবং বিশাল চোখ দর্শকদের মোহিত করত! রিকশাচিত্রে সিনেমার তারকাদের প্রাধান্য থাকলেও শহরের রিকশায় তাজমহল, প্রাণী, ফুলেল নকশা, ধর্মীয় বিষয়াদি, গ্রামীণ পটভূমি এমনকি উড়োজাহাজের চিত্রও নিয়মিতই দেখা যেত। ধীরে ধীরে রিকশাচিত্র শুধু রিকশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ফ্যাশনের জগতেও এর উল্লেখযোগ্য ছাপ পরতে শুরু করে। ২০০০-এর দশক থেকে জামা কাপড়ে রিকশাচিত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় ও নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড হিসেবে চালু হয়। পাশাপাশি রিকশাচিত্র আঁকা গৃহসজ্জার বিভিন্ন আসবাবপত্রে নান্দনিকতা এনে বাড়ির চেহারা বদলে দিতে শুরু করে। আশির দশক থেকেই শিল্পপ্রেমীরা দেয়ালে টানানোর জন্য রিকশাচিত্র সংগ্রহ করতেন। তবে এখন অনেকেই আসবাবপত্রে রিকশাচিত্রকে স্থান দিচ্ছেন।

বছরের পর বছর ধরে রিকশাচিত্রে শুধু আমাদের চলচ্চিত্র জগতের তারকা, ফুল, পাখি ও প্রকৃতিই স্থান পায়নি, আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের সাক্ষীও এটি। রিকশাচিত্র আমাদের দেশের মানুষের কথা বলে, এই অনন্য শিল্পটি সম্পূর্ণভাবেই আমাদের। ❑

প্রাবন্ধিক

অতিথি পাখির আসা-যাওয়া

মো. ইকবাল হোসেন

শীতকাল এলেই জলাশয়, বিল, হাওড়, পুকুর ভরে উঠে রং-বেরঙের পাখিতে। আদর করে আমরা তাদের ডাকি অতিথি পাখি। এই পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে আসে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে। বিচিত্র তাদের বাচ্চা পালন, বাসা তৈরির কৌশল। শুধু ইউরোপ আর এশিয়ায় আছে প্রায় ৬০০ প্রজাতির পাখি। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি পাখি আসে বাংলাদেশে। ইংল্যান্ডের নর্থ হ্যামশায়ার, সাইবেরিয়া কিংবা এন্টার্টিকার তীব্র শীত থেকে বাঁচতে দক্ষিণের কম শীতের দেশে আসে পাখিরা। এই পাখিদের শারীরিক গঠন খুবই মজবুত। এরা ৬০০ থেকে ১৩০০ মিটার উঁচু দিয়ে উড়তে পারে। দিনে-রাতে এরা প্রায় ২৫০

কিলোমিটার উড়তে পারে। মজার বিষয় হলো, এসব পাখি তাদের গন্তব্যস্থান ঠিকভাবেই নির্ণয় করে।

এ সময় অতিথি পাখি আসার কারণ হলো তারা তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে অপেক্ষাকৃত কম শীত প্রধান দেশে চলে যায়। তাছাড়া এ সময় শীতপ্রধান এলাকায় খাবারেরও প্রচুর অভাব থাকে। তাপমাত্রাও থাকে শূন্যেরও বেশ নিচে। আরো থাকে তুষারপাত। তাই ওখানে কোনো গাছপালা জন্মাতে পারে না। তাই শীত এলেই উত্তর মেরু, সাইবেরিয়া, ইউরোপ, এশিয়ার কিছু অঞ্চল, হিমালয়ের অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা আসে। মার্চ-এপ্রিলে শীতপ্রধান অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করে, গাছপালাও ধীরে ধীরে জন্মায়। অতিথি পাখিরাও নিজ বাসস্থানে ফিরে যায়। বন্ধুরা, তোমরা কি জানো এসব। অতিথি পাখিরা কিন্তু সময় শেষে ফিরে গিয়ে তাদের বাড়ি ঠিক চিনে নেয়।

অতিথি পাখিদের মধ্যে সোনাজঙ্গ, খুরুলে, কুনচুষী, বাতারণ, শাবাজ, জলপিপি, ল্যাঞ্জা, হরিয়াল, দুর্গা, টুনটুনি, রাজশকুন, লালবন মোরগ, তিলে ময়না, রামঘুঘু, জঙ্গি বটের, ধূসর বটের, হলদে খঞ্জনা ও কুলাউ ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া রয়েছে স্বচ্ছ পানির খয়রা চকাচকি, কার্লিউ, বুনো হাঁস, ছোট সারস, বড় সারস, হেরন, নিশাচর হেরন, ডুবুরি পাখি, কাদাখোঁচা, গায়ক রেন, রাজসরালি, পাতিকুট, গ্যাডওয়াল, পিনটেইল, নরদাম সুবেলার, কমন পোচার্ড, পাতিহাঁস, বুটিহাঁস, বৈকাল প্রভৃতি।

অতিথি পাখির কলরবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস লেকে প্রায় ২০-২৫ প্রজাতির পাখি আসে। এ ছাড়া মিরপুর চিড়িয়াখানার লেক, বরিশালের দুর্গাসাগর, নীলফামারীর নীল সাগর, সিরাজগঞ্জের হুরা, আর সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর এসব অতিথি পাখিদের প্রিয় অবকাশ কেন্দ্র।বেশ কয়েক বছর ধরে নিঝুম দ্বীপ দুবলার, চরকুতুবদিয়া এলাকাতেও শীতের পাখিরা বসতি গড়েছে।

শীতে শিশুর যত্ন

শীতে শিশুরা অল্পতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্নের। আবহাওয়া শুকনো থাকায় তাদের ত্বকেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। শীতে শিশুরা সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, জ্বর ও নিউমোনিয়ায় বেশি আক্রান্ত হয়। শীতের শুষ্কতা ও ধুলাবালুই যার মূল কারণ।

শিশুকে সবার আগে সরাসরি ঠান্ডা বাতাস ও ধুলাবালু থেকে দূরে রাখতে হবে। এ রোগগুলো সংক্রামক। তাই যতটা সম্ভব শিশুদের জনসমাগমপূর্ণ জায়গায় কম নিতে হবে।শিশুদের গামছা, রুমাল, তোয়ালে আলাদা হওয়া উচিত। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে। স্কুলে বা বাইরে গেলে অবশ্যই মুখে ভালোমানের শিশু-উপযোগী মাস্ক পরাতে হবে। এ সময় শিশুকে আদা লেবু চা, গরম পানিতে গড়গড়া, মধু ও তুলসী পাতার রস খাওয়ানোর অভ্যাস করা দরকার।হালকা কুসুম গরম পানি অনেক রোগের বিরুদ্ধেই লড়ে। তাই শিশুর পানির ফ্লাস্কের পানি যেন গরম থাকে।ঠান্ডার কারণে অনেক শিশুর মুখ ধোয়ায় অনীহা থাকে। ঘুম থেকে উঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার দিকে তাই এ সময় বাড়তি নজর দিতে হবে।

শীত পড়লেও নিয়মিত গোসল করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম পানি ব্যবহার করা ভালো। তবে নবজাতক কিংবা ঠান্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে শরীর মুছে দেওয়া যেতে পারে।অনেকেই শীতে শিশুকে সরিষার তেল মাখিয়ে গোসল করিয়ে থাকেন। এতে গোসল শেষেও শিশুর চুল ভেজা থাকে এবং ঠান্ডার লাগার আশঙ্কা থাকে। হালকা শীতেও শিশুকে উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর গরম কাপড় বা উলের পোশাক পরানো উচিত।হালকা শীতে শিশুর পোশাকটি খুব বেশি গরম কাপড়ের হওয়া উচিত নয়। শিশুরা দ্রুত ও বেশি ঘামে। এতেও ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতার গেঞ্জি পরিয়ে রাখতে হবে।

শীতের সময়টা শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। এ সময় পুষ্টিকর খাবারে নজর দিতে হবে। ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস খাওয়ানো যায়। এসব শিশুরা মজা করেই খাবে। গাজর, বিট, টমেটো এসব ত্বকের জন্য উপকারী। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শীতের সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ানো যেতে পারে। এ সময় আইসক্রিম জাতীয় ঠান্ডা খাবার দেওয়া যাবে না।শিশুদের ত্বক বেশি সেনসেটিভ। তাই অল্পতেই রুক্ষ হয়ে পড়ে। মুখে ও সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। যদি শিশু ঘুমের সময় জোরে মুখ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে শ্বাস ফেলতে থাকে বা কাশি হয় তবে সে হয়তো কোনো সংক্রমণে আক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ সর্দি-কাশি হলে এমনিতেই সেরে যাবে। শিশু যেন রাতে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পায় এজন্য ঘুমানোর কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে টেলিভিশন এবং মোবাইল থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। বই পড়ার অভ্যাস করাতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে হারালো বাংলাদেশ

গত বছর নিউজিল্যান্ডকে তাদের ঘরের মাটিতে টেস্টে প্রথমবারের মতো হারায় বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক সেই জয়ের পর আরো এক স্মরণীয় জয় পেল বাংলাদেশ। নিজেদের মাটিতে সিলেট টেস্টে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডকে ১৫০ রানে হারালো। জয়ের জন্য শেষ দিনে বাংলাদেশের দরকার ছিল ৩ উইকেট। নাঈম আর তাইজুল প্রথম সেশনেই এই তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পান তাইজুল।

বাংলাদেশের দেওয়া ৩৩২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে কিউইরা। তাইজুল ইসলামের ঘূর্ণিতে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল তারা। কিউইদের শেষ ভরসা ড্যারিল মিচেল শেষ দিনের সকালে ১২০ বলে ৫৮ রান করে নাঈম হাসানের বলে তাইজুলের হাতে ধরা পড়েন। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টিম সাউদি মাঠে এসে পালটা আক্রমণ করে । তিনি আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ২ ছক্কা ও ১ চারে ২৪ বলে ৩৪ রান করেন। শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন ইশ সোধি। তিনি ৯১ বলে ২২ রান করে তাইজুলের শিকার হন। ১৮১ রানে শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস।

২৮শে নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। টস জিতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ মাহমুদুল হাসান জয়ের ৮৬ রানে ভর করে ৩১০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে কেন উইলিয়ামসনের ১০৪ রানে ভর করে ৩১৭ রান করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হাসান শান্তর ১০৫ রানে ভর করে ৩৩৮ রান সংগ্রহ করে টাইগাররা। এতে করে নিউজিল্যান্ডের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৩১ রানের। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড মাত্র ১৮১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এতে করে ১৫০ রানের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

হাওর পাড়ের শিশু পেল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

ভাটির জনপদ সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ের শিশু শিল্পী ফারজিনা আক্তার। 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' চলচ্চিত্রে হাওর পাড়ের মানুষের জীবন - জীবিকার কঠিন সংগ্রামের দৃশ্যপটে অভিনয় করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছে ফারজিনা।

১৪ই নভেম্বর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার গ্রহণ করে ফারজিনা।

চার বছর বয়সি ফারজিনা আক্তার তাহিরপুর উপজেলার ছিলানি তাহিরপুর গ্রামের কৃষক আবু সায়েমের মেয়ে। সে জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী । অভাবে পড়ে তার বাবা নিজেদের বাড়িটি বিক্রি করে দেন। তারপর থেকে নানা শাহ পরানের বাড়ির একটি কুড়ে ঘরে থাকে তারা। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে ফারজিনা আক্তার। ফারজিনারা দুই বোন এক ভাই।

হাওর পাড়ের মানুষের জীবন - জীবিকার কঠিন সংগ্রামের দৃশ্যপট নিয়ে পরিচালক মুহাম্মদ কাইয়ুম ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওরাঞ্চল টাঙ্গুয়ার হাওর পাড়ে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' সিনেমার প্রাক- প্রযোজনা শুরু করেন এবং ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত চিত্রগ্রহণের কাজ করেন। পরে টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকায় শুটিং লোকেশন দেখতে যান পরিচালক মুহাম্মদ কাইউম। সেখানে একটি বাড়ি শুটিংয়ের জন্য পছন্দ করেন পরিচালক। বাড়িটি ছিল ফারজিনার নানার । আর সে সময় ফারজিনাকে দেখে পরিচালকের শিশু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পছন্দ করেন। তখন ফারজিনার বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর। শুরুতে রাজি না হলেও পরে অসাধারণ অভিনয় করে ফারজিনা। তাকে শিখিয়ে দিলে সে অনুযায়ী অভিনয় করে। সে তখন জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো অভিনয় অভিজ্ঞতা নেই। হাওরের পাড়ে থেকে বড়ো বড়ো ঢেউ ও দুর্যোগ দেখে দেখে সে বড়ো হয়েছে। শিশুটি অনেক মেধাবী, কিছু শিখিয়ে দিলে সে সহজেই শিখতে পারে। কোনো রকমের প্রাতিষ্ঠানিক অভিনয় শিক্ষা ও নূন্যতম প্রশিক্ষণ ছাড়াই 'কুড়া পক্ষির শূন্যে উড়া' ছবিতে ফারজিনা শিশু শিল্পী হিসেবে অনবদ্য অভিনয় করে পুরস্কৃত হয়েছে।

তাহিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুপ্রভাত চাকমা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অভাব, অনটন, দারিদ্র্য কোনোটিই শিশুদের মেধা বিকাশের অন্তরায় হতে পারে না। ফারজিনা এটি প্রমাণ করে দিয়েছে। এই হাওর পাড়ে অসংখ্য প্রতিভাবান শিল্পী আছে, সুযোগ পেলে তারাও তাহিরপুরের জন্য সম্মান বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। ❑

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

অন্যের কণ্ঠ নকল

পৃথিবীর অন্যতম কঠিন কাজ হচ্ছে অন্যের কণ্ঠ নকল করা। সেই কঠিন কাজটি খুব সহজে করে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন নোমান। দেখে বোঝার উপায় নেই তার কণ্ঠেই রয়েছে জাদু। মোটু-পাতলুসহ যে কারও কণ্ঠ হুবহু নকল করতে পারেন তিনি। স্কুলে কণ্ঠ নকল করে বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদানে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে। ঝিনাইদহ সিদ্দিকিয়া সড়কের পাশে ঝিনাইদহ ইসলামিক আইডিয়াল স্কুল। সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক আব্দুল্লাহ আল নোমান।

সরেজমিনে ওই স্কুলে গেলে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা স্কুল আঙিনায় সারি সারি বসে আছেন। কেউ কেউ নকশি কাঁথা সেলাই করছেন। ক্লাসে ঢুকতেই দেখা মেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল নোমানের। বিভিন্ন জনপ্রিয় কার্টুনের চরিত্রের কণ্ঠ হুবহু নকল করে শিশুদের ক্লাস নিচ্ছেন তিনি। বিনোদনের সঙ্গে চলছে পড়াশোনা। শিশুরাও পাচ্ছে অনাবিল আনন্দ।

এছাড়াও নোমান যে-কোনো চরিত্রের মিমিক্রি করতে পারেন। ক্রিকেট বা ফুটবলের ধারা ভাষ্যকারদের মিমিক্রি যে এত সহজে করা সম্ভব তা নোমানকে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় সব গায়কের কণ্ঠের গানও গাইতে পারেন। যা শুনলে সবাই অবাক হন। নোমানের এ সব ভিন্ন-ভিন্ন কণ্ঠের যাদুতে মুগ্ধ এলাকাবাসী, শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের অবিভাবক এবং শিক্ষকরা। আব্দুল্লাহ আল নোমান জানান এটা দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল। এর জন্যে তাকে বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। নোমান মিমিক্রি করে শুধু দেশে নয় ভারতেও বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান বেপারীপাড়া এলাকার আকরামুল হক ও নাসরিন নাহার দম্পতির দুই ছেলের মধ্যে বড়ো। তিনি মালয়েশিয়ার কুয়লালামপুর ইউনিভার্সিটি অব আর্টস থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। ২০২০ সালে করোনার সময় রাজশাহী মেডিকেল কলেজে খণ্ডকালীন ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ায় চাকরির মেয়াদ শেষ হলে বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর নিজেই এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তার মতে নতুন প্রজন্ম যেন বড়ো হয়ে বাবা-মায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বড়োদের সম্মান করে। নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারে। এজন্যই ছোটো থেকে সবার মধ্যে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। নোমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান অনেক ভালো। এ কারণে পাড়ার ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি দূর থেকেও বাচ্চারা সেখানে পড়তে যায়।

ছাত্ররা জানায় তাদের নোমান স্যার খুব ভালো। কোথাও গেলে তাদের জন্য চকলেট নিয়ে আসেন। খুব সুন্দর করে বাংলা ইংরেজি পড়ান। মটু-পাতলুর মতো করে তাদের সাথে কথা বলে আনন্দ দেন। এজন্য প্রতিদিন স্কুলে আসে শিক্ষার্থীরা। স্কুলের সহকারী শিক্ষক নাজনিন নাহার জানান, স্যারের কারণে মাত্র এক বছরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ১০০ ছাড়িয়েছে। এ এক বিরল প্রতিভা। যে কারো মন ভালো হয়ে যাবে যখন তখন।

নোমান বাংলাদেশের একজন সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি। ৯ বার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তারপরও করোনা আক্রান্তদের সাহায্য করে গেছেন নিজের জীবন বাজি রেখে। ❑

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ছয় সাঁতারুর সাফল্য

থাইল্যান্ডের ফুকেটে অনুষ্ঠিত দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতা 'ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়নশিপে' অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ৬ জন সাঁতারু সফল হয়েছেন। আন্দামান সাগরে ১০ কিলোমিটার দূরত্বের ওশেনম্যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতার শুরু হয় ২রা ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টায়।

ওশেনম্যানের বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ সারা বছরই বিভিন্ন দেশে সমুদ্রে দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। 'ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল চ্যাম্পিয়নশিপ' এরই সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা। ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল ও ওশেনম্যান ওপেন- এই দুই শ্রেণিতে ১০ কিলোমিটার দূরত্বের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতারে ৭২ দেশের মোট ২২৯ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। আগে ওশেনম্যানের মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এর ফলাফলের ভিত্তিতে ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনালে সুযোগ পায়। ওশেনম্যান ওপেনে সাঁতারুরা সরাসরি নিবন্ধন করে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।

ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান শিপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাঁতারুদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম রাসেল সবচেয়ে দ্রুত সাঁতার শেষ করেন। ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় নিয়ে ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল শ্রেণিতে ১৪০ জন সাঁতারুর মধ্যে ৩৩তম স্থান অর্জন করেছেন মো. সাইফুল ইসলাম। নিজের ২০-২৯ বছর বয়স গ্রুপে তাঁর অবস্থান সপ্তম।

ওশেনম্যান ওয়ার্ল্ড ফাইনাল শ্রেণিতে বাংলাদেশের মো. ইসতিয়াক উদ্দিন সাঁতার সম্পন্ন করেছেন ৩ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৯ সেকেন্ডে। তাঁর অবস্থান ৯৬তম। ২০-২৯ বছর বয়স গ্রুপে তিনি হয়েছেন ১৭তম। ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়স গ্রুপ থেকে আবদুল্লাহ আল ইমরান ৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট ৯ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করেছেন। তাঁর অবস্থান ১২২তম। নিজের বয়স গ্রুপে হয়েছেন ১৯তম। ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে ১২৯তম স্থানে আছেন আলী রওনক ইসলাম। নিজের বয়স গ্রুপে (২০-২৯ বছর) হয়েছেন ২১তম।

প্রতবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২৩-এর ষষ্ঠ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) শিক্ষার্থীর দল অ্যাপোক্যালিপস। দলের সদস্যরা হলেন সাদিয়া আহম্মেদ, জিশানুল ইসলাম ও সাহিদ হোসেন। এরা তিনজনই বিশ্ববিদ্যালয়টির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে প্রজেক্ট কোর্স করার সময় এই শিক্ষার্থীরা একটি প্রজেক্ট তৈরির কথা ভাবেন। ২০২১ সালে প্রথম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস নিয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরস্কার লাভ করেন তিন বন্ধু। সে সময় তাঁরা একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিলেন, যা শিক্ষার্থীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করত। এভাবেই অ্যাপোক্যালিপসের শুরু।

বিশ্ববিদ্যালয়টির এক শিক্ষকের অনুপ্রণায় তিন বন্ধু ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে ব্লকচেইন চর্চা শুরু করেন। এ সময় তাঁরা আইডিয়া খুঁজে পান মেধাস্বত্ব বা অ্যাপোক্যালিপসের।

আইপি ব্লকচেইন প্রো অ্যাপোক্যালিপসের বানানো ব্লকচেইনভিত্তিক একটি সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে, খুব সহজে ও নিরাপদে পেটেন্ট রেজিস্টার করা যায়। এতে তথ্য চুরি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পেটেন্ট বা ট্রেডমার্ক পাওয়া যাবে। অ্যাপোক্যালিপস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে যাতে একজন ব্যবহারকারী বা গবেষক খুব সহজে নিজে পেটেন্ট করতে পারবেন। ধাপে ধাপে তথ্য পূরণের মাধ্যমেই আবেদনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে।

ব্লকচেইন হলো একধরনের ডিজিটাল লেজার টেকনোলজি, যা তথ্য রেকর্ড করে। আমাদের চারপাশের সবকিছুই কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ব্লকচেইন বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করে। এখানে একক কোনো ব্যক্তি সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ না করে অনেকগুলো

কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ডেটা চুরির সুযোগ নেই।

ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের রাউন্ডে দলটি সিলভার অ্যাওয়ার্ড পায়। এ পর্যায়ে প্রতিযোগীদের ১০ মিনিটের ভিডিও, পিচ ডেক ও পেপার জমা দিতে হয়।

১৫ থেকে ১৭ই নভেম্বর ২০২৩ নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডের ষষ্ঠ আসর। এবারের আসরে যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, হংকং, ভারত, বাংলাদেশসহ ১৯টি দেশ ও ইউরোপ অঞ্চলের প্রায় ৫০টি দল অংশ নেয়। বাংলাদেশ থেকে ৫টি দল আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে সরাসরি অংশ নেয় এবং ৪টি দল অনলাইনে যুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতায় অ্যাপোক্যালিপসের প্রকল্পটির নাম ছিল 'আইপি ব্লকচেইন প্রো'। এবারের বিশ্ব আসরের আয়োজক ছিল হল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস। প্রকল্পের প্রভাব, বিশ্বস্ততা ও বাণিজ্যিক বাস্তবায়নের সক্ষমতা- এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করে চ্যাম্পিয়ন দল ঘোষণা করা হয়।

নভেম্বরের ১৬ তারিখ একজন মডারেটরের মাধ্যমে সব কটি দল নিয়ে একটি ডিসকাশন রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রজেক্টের মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়। ১৭ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অ্যাপোক্যালিপসের প্রজেক্ট বা প্রকল্পটি নিয়ে বিচারকদের সামনে একটি পোস্টার প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। পাশাপাশি দর্শক এবং বিচারকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়।

এসবের ওপর ভিত্তি করে সেরা পাঁচটি দল সবার সামনে পিচ বা প্রেজেন্টেশন দেয়। সবটা বিবেচনা করে টিম অ্যাপোক্যালিপসকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। ফাইনালে জেতার পুরস্কার হিসেবে অ্যাপোক্যালিপস ২ হাজার ৪০০ ইউরো প্রাইজমানি পায়। এই অর্থ দিয়ে দলটির সদস্যরা সফটওয়্যারটির উন্নত করায় আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দেশে ব্লকচেইনভিত্তিক সফটওয়্যারের প্রসার ঘটাতে চায় টিম অ্যাপোক্যালিপস। ❑

প্রতিবেদনঃ মো. সারোয়ার হোসেন

পতাকা

মো. সাকিবুল ইসলাম

বিজয়ের লাল সবুজ পতাকা
উড়ছে আকাশ পানে
যাঁদের আত্মত্যাগে পেয়েছি এ পতাকা
স্মরণ করি তাদের মনে প্রাণে।

নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে
পেয়েছি এমন একটি দেশ
সকল দেশের সেরা
আমাদের প্রিয় সোনার বাংলাদেশ।

৭ম শ্রেণি,
মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়
দাউদকান্দি, কুমিল্লা

বিজয়

রুপা আক্তার

এসো সবাই মিলে গাই
মহান বিজয়ের গান
গানে গানে ভরে উঠুক
সকলের মন প্রাণ।

বিজয়ের উল্লাসে আজ
রক্তিম সূর্য হাসে
মুক্তিকামী সকল জনতা
আনন্দ উল্লাসে ভাসে।

৭ম শ্রেণি
বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয়
নেত্রকোনা

হাঁটলেই পৌঁছানো যাবে ১৪টি দেশে

এক রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলেই পৌঁছে যাবে ১৪টি দেশে! বন্ধুরা, অবাক করা বিষয় হলেও সত্যিই এমন সুযোগ পাবে তুমি। যদি বিশ্বের দীর্ঘতম হাইওয়ে ধরে চলতে শুরু করো তখন পেরিয়ে যেতে পারবে মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা ও উত্তর আমেরিকার মতো দেশ-মহাদেশের সীমানা।

বলছি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ও দীর্ঘতম রাস্তা প্যান-আমেরিকান হাইওয়ের কথা। পথটি শুরু হয়েছে উত্তর আমেরিকা থেকে। এই পথ আলাস্কা থেকে শুরু হয়ে ১৪টি দেশ পেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় শেষ হয়ে যায়। দৈর্ঘ্যের কারণে এর নাম গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই মহাসড়ক তৈরি করতে অবদান রয়েছে ১৪টি দেশের। এই দেশগুলোর নাম হলো- কোস্টারিকা, পেরু, পানামা, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা, বলিভিয়া, এল সালভাদর, কলম্বিয়া, চিলি, কানাডা ও আর্জেন্টিনা। কেউ যদি প্রতিদিন ৫০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে, তাহলে এই পথটি প্রায় ৬০ দিনে সম্পূর্ণ করতে পারবে। কার্লোস সান্তামারিয়া নামে একজন সাইক্লিস্ট পথটি ১১৭ দিনে সম্পূর্ণ করে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন। এই বিশাল মহাসড়কের সব রুট একত্রিত করলে দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৪৮ হাজার কিলোমিটার। এই পথ দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে নিজের সঙ্গে গাড়ি বা বাইক মেরামতের সব ধরনের সরঞ্জাম থাকা জরুরি।

ছয় বছর বয়সে গিনেস বুকে রেকর্ড

ছোট্ট বন্ধু সিমর খুরানা। বয়স মাত্র ছয় বছর। এ বয়সে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে সে। বলা হচ্ছে, বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ভিডিওগেমার সিমর। থাকে কানাডার অন্টারিওতে। শিশুদের কী ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত, তা নিয়ে ভিডিও তৈরি করে সিমর। ভিডিও গেম তৈরি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে খুদে এই বন্ধু। সিমর খুরানা ছোটো বয়সেই কোডিং শেখা শুরু করে। বাবা পরশ খুরানা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেছেন, ইউটিউবে ভিডিও দেখে সিমর নিজেই অঙ্ক শিখেছে। কিন্ডারগার্টেনে পড়ার সময় সে গ্রেড থ্রি'র অঙ্ক করতে পারত। সে নিজে যা পেত, তা দিয়ে নানা ধরনের গেম তৈরি করত। অনেক সময় পুরোনো কাগজ দিয়েও শিল্পকর্ম তৈরি করত। সিমর প্রথম যে গেমটি তৈরি করেছিল, তার নাম ছিল 'হেলদি ফুড চ্যালেঞ্জ'। সে এ গেমের ধারণা পায় তখন, যখন চিকিৎসক তাকে জাঙ্ক ফুড খেতে বারণ করেছিলেন। কেন জাঙ্ক ফুড খাওয়া উচিত নয়, সিমর সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চায় শিশু শিক্ষার্থীদের। সিমর অঙ্ক ও কোডিং ভালোবাসে। সে ভবিষ্যতে গেম ডেভেলপার হতে চায়।

বোতলে পৃথিবীর বিশুদ্ধতম বাতাস

পৃথিবীর প্রত্যেকদিনের বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে নিতে মানুষ এখন ক্লান্ত। মানুষ এমন জায়গা খোঁজে, যেখানে বাতাস নির্মল। যন্ত্রসভ্যতার ধুলো নেই, গাড়ির ধোঁয়া নেই। নেই দূষণ। তেমনই এক জায়গা রয়েছে এই পৃথিবীতেই। বস্তুত, এই জায়গাতেই পৃথিবীর বাতাস নির্মলতম (cleanest air)। জানো বন্ধুরা কোথায় আছে এই জায়গা? বিবিসির রিপোর্ট অনুযায়ী, এই জায়গাটি অস্ট্রেলিয়ার কাছে তাসমানিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ, যার নাম কেপ গ্রিম (Cape Grim)। বিশুদ্ধ বাতাসের উপস্থিতির কারণেই এই নির্জন জায়গাটি ক্রমশই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষের বাসস্থান থেকে এই জায়গাটি এতটাই দূরে যে এখানে পৌঁছানো কঠিন। যারা কেপ গ্রিমে যেতে পারেন না, তাদের কাছে তাসমানিয়ার ব্যবসায়ীরা বোতলে ভরে বিশুদ্ধ বাতাস বিক্রি করছেন। দূষণমুক্ত পরিবেশে থাকা মানুষজন দিব্যি টাকা দিয়ে সেই বাতাস কিনছেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ৩.বড়ো, ৫. বক, ৬. খাজনা, ৮. সৈন্য, ৯. বৃক্ষ, ১০. অপ্রাপ্তবয়স্ক, ১১. ধুরন্ধর, ১৩.পিতামহ, ১৫. এশিয়ার একটি দেশ, ১৬. সাজসজ্জা

উপর-নিচ: ১. যে লেখে, ২. সদ্যোজাত শিশু, ৩. অপরাহ্ন, ৪. ঢেউ, ৭. সপ্তাহের একটি দিন, ১১. জ্যামিতির একটি আকৃতি, ১২.সম্রাট, ১৪. কর্ম, উৎসর্গ

১.			২.	■	৩.		৪.
	■	■	৫.			■	
৬.	৭.	■		■	৮.		
■		■	৯.		■	■	■
১০.				■	১১.		
■		■	■	■		■	■
১২.	■	১৩.		■		■	১৪.
১৫.			■	১৬.			

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: সুপারিশপত্র, ছাড়পত্র, চাবি, পর্ব, পত্রবাহক, কারিশমা, মালবাহী, পাহাড়, পতাকা, কাপড়, বড়ো

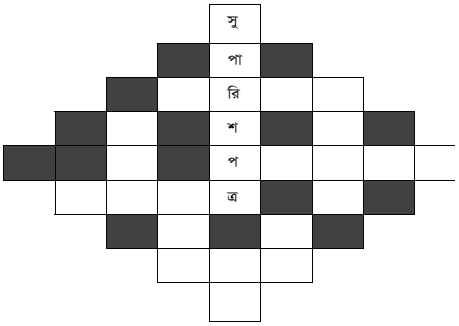

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

		৬৫	৬২		৬০	২৭		২৫
৬৮	৬৯			৫৮			২৯	
৭১		৮১	৫৬			৩৩		
	৭৯				৩৫		৩১	
		৭৭		৩৭		১৯		২১
৭৪	৭৫		৫৩		১৭		১১	
৪৭		৫১	৫২		১৬			৯
	৪৯	৫০		৪০		১৪	৭	
৪৫			৪২	১				৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৬	*		-	৪	=	
+	■	*	■	+	■	*
	*	২	-		=	১
-	■	+	■	-	■	+
৪	/		+	৩	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৬	*		=	৬

নভেম্বর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

অ	স্ট্রে	লি	য়া		ক		আ
স		স			ল	সা	গু
লো		ব		নি	ম		ন
	কা	ন	ন				মু
	না			শী	ত		খা
ডা	মা	ডো	ল		বু	ই	
	ছি		লা				
			ট	স	ট	সে	

ছক মিলাও

				হে				
				ম				
		অ	ন	ন্ত	কা	ল		
		নু		কা		ড়া		
আ	ত	স		ল		কু	মা	র
		ন্ধা			ছা		ন	
		ন	ল	খা	গ	ড়া		
				মা	ল			
				র				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৫	*	২	-	৬	=	৪
+		-		-		-
৩	*	১	-	২	=	২
-		+		*		+
২	+	৪	-	১	=	৫
=		=		=		=
৬	+	৫	-	৪	=	৭

নাম্ব্রিক্স

৭৭	৭৬	৭৫	৩৪	৩৩	২০	১৯	১৮	১৭
৭৮	৮১	৭৪	৩৫	৩২	২১	২২	২৩	১৬
৭৯	৮০	৭৩	৩৬	৩১	৩০	২৯	২৪	১৫
৭০	৭১	৭২	৩৭	৩৮	৩৯	২৮	২৫	১৪
৬৯	৬০	৫৯	৫৮	৪১	৪০	২৭	২৬	১৩
৬৮	৬১	৫৬	৫৭	৪২	৪৩	৮	৯	১২
৬৭	৬২	৫৫	৫০	৪৯	৪৪	৭	১০	১১
৬৬	৬৩	৫৪	৫১	৪৮	৪৫	৬	৩	২
৬৫	৬৪	৫৩	৫২	৪৭	৪৬	৫	৪	১

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

আগামীতে লেখক সম্মানী ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এজন্য সম্মানিত লেখকগণকে লেখার সাথে ব্যাংক একাউন্টের নাম, হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও শাখা এবং রাউটিং নম্বর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হিসাব নম্বর চালু করার অনুরোধ করা হলো।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

সুমিত, দ্বিতীয় শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

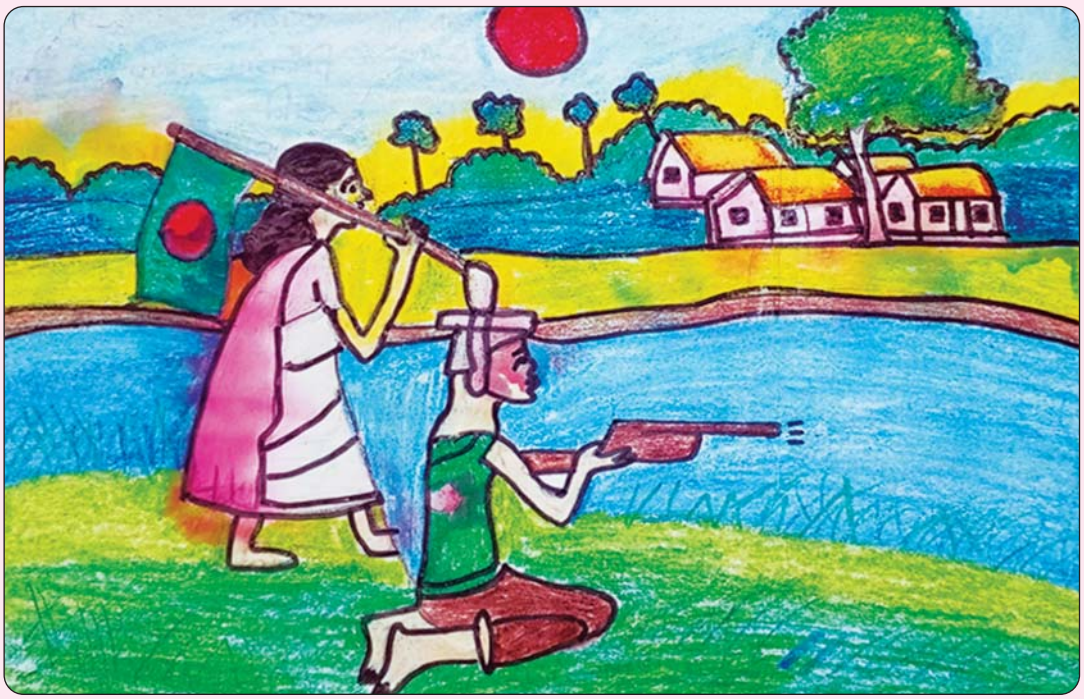

আয়ান হক ভুঁইয়া, তৃতীয় শ্রেণি, খিলগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-06. December 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

আফিফা মাইমুনা লাবিবা, দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা